গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ সাতক্ষীরা

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
মোঃ সাইদ ইফতেখার

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
সাতক্ষীরা

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ী : ৪এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েবসাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস

জেলা তথ্য : সাতক্ষীরা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং মোঃ সাইদ ইফতেখার যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ ও ড. মোঃ লিয়াকত আলী। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় রয়েছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে সাতক্ষীরা জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বিবিএস - এর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে সাতক্ষীরার উপরে লিখিত অন্যান্য বই থেকে -

১. হোসেন, মোঃ আবুল, ২০০১। সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস। শহীদ নাজমূল সরনী, সাতক্ষীরা। সাতক্ষীরা, এপ্রিল, ২০০১।

২. বি.বি.এস., ২০০৩। কৃষি শুমারী ১৯৯৬ : জেলা সিরিজ সাতক্ষীরা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, এপ্রিল, ২০০৩।

৩. বি.বি.এস., ১৯৯৩। আদম শুমারী ১৯৯১ : জেলা সিরিজ সাতক্ষীরা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৩।

৪. ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৫. CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh, Final Report, Centre for Environmental and Geographic Information Services. Dhaka, May 2004.

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে সাতক্ষীরা জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

এ ছাড়াও বইটির পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাব মোঃ মহসিন হোসেন বাবলু, সম্পাদক, দৈনিক আজকের সাতক্ষীরা এবং প্রেসিডেন্ট, প্রেসক্লাব, সাতক্ষীরা।
- জনাব এম.এ. মজিদ, উপ-পরিচালক, বি.আর.ডি.বি, সাতক্ষীরা।
- জনাব অশীত কুমার মজুমদার, প্রিন্সিপাল (অব:), সাতক্ষীরা।
- জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা।
- জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, সম্পাদক, দৈনিক সাতক্ষীরা চিত্র, সাতক্ষীরা।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা ১
এক নজরে সাতক্ষীরা ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারনী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ ৭
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭
কৃষি সম্পদ ১১
দুর্যোগ ১৩
বিপদাপন্নতা ১৪

জীবন ও জীবিকা ১৫
জনসংখ্যা ১৫
জনস্বাস্থ্য ১৫
শিক্ষা ১৬
অভিবাসন ১৬
সামাজিক উন্নয়ন ১৬
অর্থনৈতিক অবস্থা ১৭
প্রধান জীবিকা দল ১৭
দারিদ্র্য ১৭

নারীদের অবস্থান ১৯

অবকাঠামো ২১
রাস্তা-ঘাট ২১
পোল্ডার ২১
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ২১
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ২১
অর্থনৈতিক অবকাঠামো ২১
শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো ২২
কৃষি অবকাঠামো ২২
উন্নয়ন প্রকল্প ২৩

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা ২৫
পরিবেশগত সমস্যা ২৫
চিংড়ি চাষের সমস্যা ২৬
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ২৮

সম্ভাবনা ও সুযোগ ৩১
কৃষি সম্পদ উন্নয়ন ৩১
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ ৩৩
শিল্প উন্নয়ন ৩৪
আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৩৪

ভবিষ্যতের রূপরেখা ৩৫

দর্শনীয় স্থান ৩৭

জেলা মানচিত্র

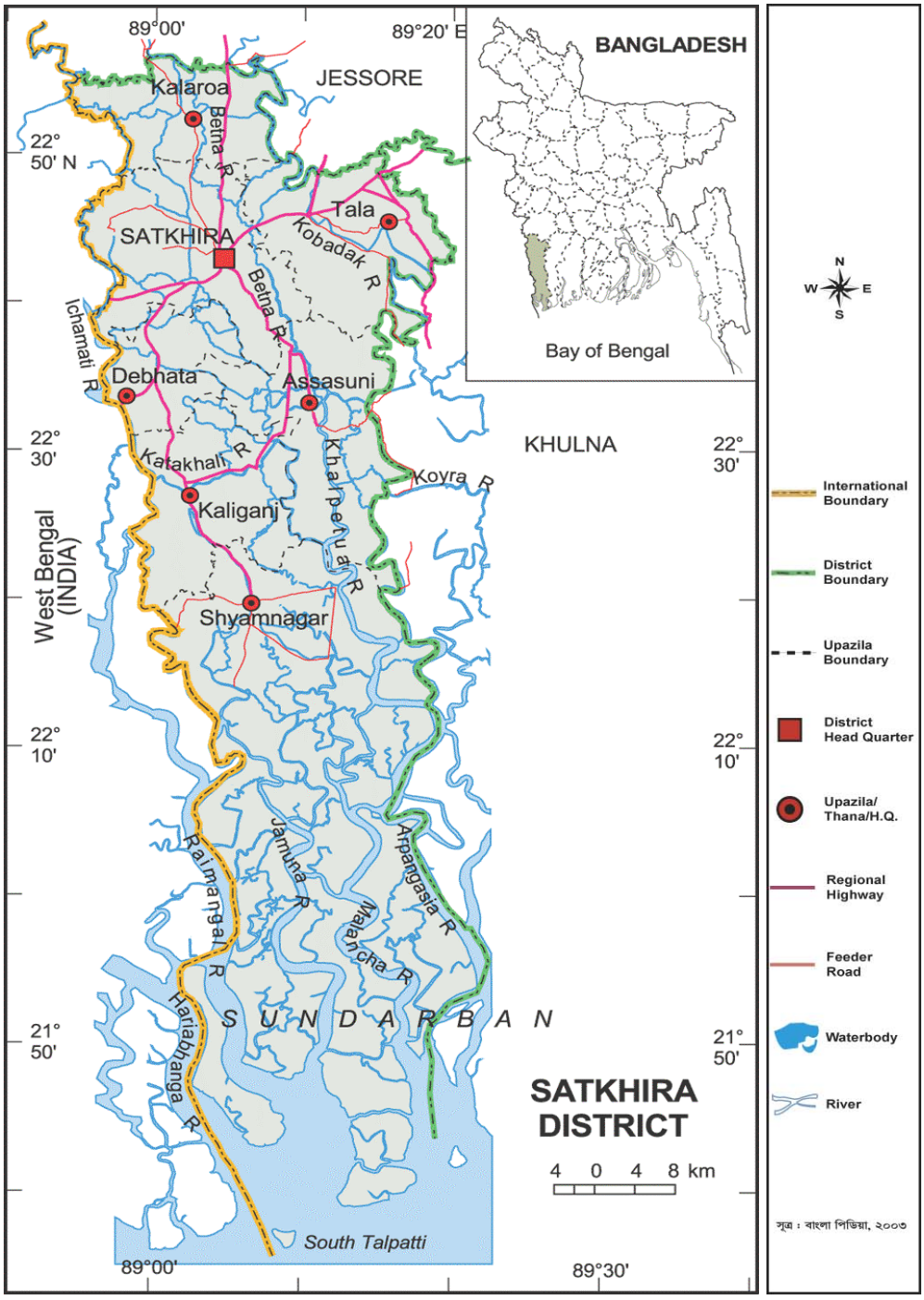

BANGLADESH
Bay of Bengal
JESSORE
KHULNA
West Bengal
(INDIA)
Kalaroa
Tala
SATKHIRA
Debhata
Assasuni
Kaliganj
Shyamnagar
Betna R
Kobadak R
Ichamati R
Katakhali R
Koyra R
Kholpetua R
Raimangal R
Jamuna R
Malancha R
Arpangasia R
Hariabhanga R
S U N D A R B A N
South Talpatti
SATKHIRA
DISTRICT
4 0 4 8 km
89°00'
89°20' E
89°30'
22° 50' N
22° 30'
22° 10'
21° 50'
N
W
E
S
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
District Head Quarter
Upazila/ Thana/H.Q.
Regional Highway
Feeder Road
Waterbody
River
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

সীমান্ত জেলা সাতক্ষীরা বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা দক্ষিণ-পশ্চিমে খুলনা বিভাগে অবস্থিত। জেলার উত্তরে যশোর জেলা, পূর্বে খুলনা জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অবস্থিত। প্রাচীনকালে এ অঞ্চল ব্যাঘ্রতট, সমতট, বুড়ন ইত্যাদি নামে অভিহিত ছিল। ১৮৫২-৫৩ সালে স্থাপিত হলেও ১৮৬১ সালে সাতক্ষীরা যশোর জেলার অধীনে একটি মহকুমা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ১৮৮২ সালে সাতক্ষীরা মহকুমা খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সাতক্ষীরা মহকুমাকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সাতক্ষীরা জেলার নামকরণ সম্পর্কে সতীশ চন্দ্র মিত্র প্রণীত 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' বই থেকে জানা যায় যে, সাতক্ষীরার জমিদারদের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তী তৎকালীন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মচারী ছিলেন। তিনি অলৌকিকভাবে বিশাল অর্থের অধিকারী হলে 'বুড়ন' পরগনা নিলামে খরিদ করেন এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে বসতি গড়ে তোলেন, কিন্তু তিনি কুলিন না হওয়ায়, নিজেকে অধিকতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে অন্যত্র থেকে সাতঘর কুলিন ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানপূর্বক তার বসতবাড়ির পার্শ্বে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। উক্ত 'সাত ঘর' বা 'সাতঘরিয়া' থেকে অপভ্রংশে 'সাতক্ষীরা' নামের উৎপত্তি। আবার কারও মতে, বিষ্ণু চক্রবর্তী 'বুড়ন' পরগনা নিলামে কেনার পর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তার বসতবাড়ির পাশে পাঁচটি মন্দির নির্মাণ করেন। উক্ত পঞ্চমন্দির উদ্বোধনের সময় তিনি সাতরকমের 'ক্ষির' পরিবেশন করেন, যা লোক পরম্পরায় পরবর্তীতে ঐ স্থানটি 'সাত ক্ষির' থেকে সাতক্ষীরা' নামে সর্বত্র পরিচিতি লাভ করে।

ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে, গুপ্ত যুগ ও বৌদ্ধ যুগে গঙ্গা ও সমুদ্রের মোহনায় অবস্থিত উপদ্বীপ অঞ্চলের নাম সমতট। ভারতের প্রয়াগে অবস্থিত অশোক স্তম্ভের ওপর সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত খোদিত বিজয় প্রশস্তিতে আছে যে, সমুদ্র গুপ্ত বিজিত সামন্ত রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল সমতট। সতীশ চন্দ্র মিত্র তার 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সমতট রাজ্যের রাজধানী ছিল যশোরের সন্নিকটে বারোবাজার নামক স্থানে। সাতক্ষীরা, খুলনা ও যশোর তখন এই সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৩৪০-৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমতট ও সুন্দরবন অঞ্চল সমুদ্র গুপ্তের শাসনাধীন ছিল। এ সময়েই বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। আনুমানিক খ্রিষ্ট্রীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে (৫২৪-৫৭৫ খৃ:) খুলনা, যশোর অঞ্চলে ৩ জন নৃপতি রাজত্ব করতেন তাদের নাম গোপ চন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব। সাতক্ষীরা অঞ্চল তাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে এই এলাকা গৌড়ের পরাক্রান্ত রাজা শশাংকের অধীনেও আসে। শশাংকের মৃত্যুর পর সমতট অঞ্চল সম্ভবত হর্ষবর্ধনের অধিকারে আসে। তার রাজত্বকালেই (৬০৬-৬৪৭ খৃ:) হিউয়েন সাং ৬৩৮ সালে সমতট ভ্রমণ করেন।

উপজেলা	**৭ টি**
পৌরসভা	**২ টি**
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	**৯৬ টি**
মৌজা/মহল্লা	**৯৮৯** টি
গ্রাম	**১,৪৩৬** টি

এই জেলার মোট আয়তন ৩,৮৫৮ বর্গ কি. মি. যা সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের ২.৬১%। জেলার মোট লোকসংখ্যা ১৮.৪৫ লাখ। আয়তনের দিক দিয়ে উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে এই জেলার অবস্থান ৪র্থ এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে এই জেলা উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে ৭ম। ৭টি উপজেলা, ২টি পৌরসভা, ৯৬টি ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ৯৮৯টি মৌজা/মহল্লা ও ১,৪৩৬টি গ্রাম নিয়ে সাতক্ষীরা জেলা গঠিত। সাতক্ষীরা সদর, আশাশুনি, শ্যামনগর, দেবহাটা, কলারোয়া, কালিগঞ্জ এবং তালা হচ্ছে জেলার সাতটি উপজেলা। উপজেলাগুলোর মধ্যে শ্যামনগরের আয়তন সবচেয়ে বড় এবং দেবহাটা সবচেয়ে ছোট যদিও সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে: জোয়ার-ভাটার প্রভাব, নোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্নিঝড় / জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে জেলার আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলা তীরবর্তী (Exposed Coast) উপকূলীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।

এক নজরে সাতক্ষীরা

	বিষয়	একক	সাতক্ষীরা	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা / প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৩,৮৫৮	৪৭,২০১	১,৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৭	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৭৯	১,৩৫১	৪,৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	২	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	১৮	৭৪৩	২,৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৯৮৯	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	১,৪৩৬	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১৮.৪৫	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৯.৩৬	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৯.০৯	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৪৭৮	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৩:১০০	১০৪.৭	১০৬.৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৪.৭	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৩.৯০	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৪	৩.৪৪	৩.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮৯	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩৭	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১৮	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৭	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৬৯	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	১০২	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	৩,০৬৪	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১৬,০৭৭	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	৬৫৯	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	৩১	২৬	২৮	২০০১ (নির্পোট, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৪৬	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	২২	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৭	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৫৫	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	১৪	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৯২	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৪৫	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫১	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৩৯	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৪৭	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫৬	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৩৮	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	১১২	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮৪	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩৬	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালের শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন / শয্যা	৬,৫৯৫	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫৭	৫১-৬৮	৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৮৭	৮০-১০৩	৯২	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	২	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	২	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	২	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৫৫	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পোট, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার (৬%) জাতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) চেয়ে অনেক বেশি।
- জেলার অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (১৪%), জাতীয় (২৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (২৪%) তুলনায় অনেক কম।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা (৫৩%) জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় কম।
- পর্যটনের দিক থেকে আকর্ষণীয়।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫ জন, যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) সমান।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৫৫%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- সাক্ষরতার হার (৭+ বছর) ৪৫%, যা উপকূলীয় অঞ্চল (৫১%) ও জাতীয় হারের (৪৫%) তুলনায় কম।
- রাস্তার ঘনত্ব (০.৬৯ কি. মি./ বর্গ কি. মি.), জাতীয় (০.৭২ কি. মি./বর্গ কি. মি.) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি. মি./ বর্গ কি. মি.) চেয়ে কম।
- জেলার ৩৬% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা উপকূলীয় অঞ্চল (৪৬%) ও জাতীয় হারের (৩৭%) তুলনায় কম।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে (৫৭) জাতীয় (৪৩) হারের তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার মাথাপিছু আয় (১৬,০৭৭ টাকা) জাতীয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও উপকূলীয় অঞ্চলের গড় আয়ের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় কম।
- জেলার দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৫৫%) জাতীয় (৪৯%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২%) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার মোট গৃহের ৮৪% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় (৯১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮৮%) হারের তুলনায় অনেক কম।
- জেলার মোট আয়ে শিল্পখাতের অবদান ১৮%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় কম।
- জেলায় ১৮% গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় কম।
- জেলার ভূমিহীনদের সংখ্যা (৫৪%) জাতীয় হারের তুলনায় বেশি (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৪%) সমান।
- হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ৬,৫৯৫ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪,৬৩৭) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার গড়ে প্রতি ১০২ বর্গ কি. মি. এলাকায় একটি হাট-বাজার কেন্দ্র আছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় অপ্রতুল।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যার ভাগ (৭%) জাতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।
- উচ্চমাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।

উপজেলা তথ্য সারনী

বিষয়		একক	সাতক্ষীরা	উপজেলা			
				সদর	আশাশুনি	শ্যামনগর	দেবহাটা
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৩,৮৫৮	৮০১	৪০২	১৯৬৮	১৭৬
	ইউনিয়ন / ওয়ার্ড	সংখ্যা	৯৭	২২	১১	১৩	৫
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৯৮৯	১৪৫	১৪৪	১২৭	৫৮
	গ্রাম	সংখ্যা	১,৪৩৬	২৩৬	২৪২	২১৬	১২২
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১৮.৪৫	৩.৯৩	২.৪৪	৩.১৬	১.২১
	পুরুষ	লাখ	৯.৩৬	১.৯৭	১.২১	১.৬০	০.৬৩
	নারী	লাখ	৯.০৯	১.৯৪	১.২৩	১.৫৫	০.৫৮
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৪৭৮	৯৭৯	৬০৬	১৬০	৬৮৪
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৩	১০২	৯৯	১০৩	১১০
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৩.৯০	০.৮৬	০.৫৩	০.৫৯	০.২৪
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৪.৭	৪.৫৮	৪.৬৩	৫.৩১	৫.০৫
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৪.০	১.৯	১.৯	১.৪	১.৩
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮৯	৯১	৯০	৮৪	৯৩
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩৭	৫৪	২১	৫	২৩
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬	১৬	২	১	৬
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১,৩১১	২৫৯	১৯৫	২১৭	৬৫
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২৪৩	৫২	৩৩	২৭	১৬
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৪০	৮	৩	৫	৩
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৪৬	৩৯	৩৬	৪৩	৩৮
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৬০	৭০	৬২	৬১	৫০
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৪০	৩১	৩৮	৩৯	৫০
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	১১৯,৪৯৭	২৩,৯৫২	১৬,৬৭৭	২০,১২৭	৪,৯৩৮
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৪৭	২২	৮৭	২৪	৭৩
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৪২	৬৯	৭	৫৫	২১
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	১১	৮	৬	২১	৬
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	৭,০০০	৭,০০০	-	৭,০০০	৬,০০০
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	%	৪৫	৪৬	৪০	৪১	৫০
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯২	৯৪	৯৩	৯২	৯৩
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৫	৯৬	৯৪	৯৯	৯৪
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	১৬,৪২৮	৩,২৭৭	২,১৫৫	৯৫৬	১,৫৮৪
	নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮১	৯৯	৭১	২৪	৯৮
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১১	১৭	৮	৫	১৯

উপজেলা			তথ্য সূত্র ও বছর
কলারোয়া	কালিগঞ্জ	তালা	
২৩৩	৩৩৪	৩৪৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২১	১২	১২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১২১	২৪৩	১৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৩৬	২৫৪	২৩০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২.২২	২.৫৯	২.৯১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.১২	১.৩১	১.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.১০	১.২৮	১.৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৯৫৫	৭৭৫	৮৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০২	১০২	১০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৫১	০.৫৩	০.৬৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৪.৪০	৪.৯১	৪.৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২.৩	১.৯	১.৩	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৯৬	৮৫	৮৬	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৮০	১০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৩	২	৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১৬০	১৭৯	২৩৬	২০০১(প্রা.শি.অ. ২০০৩)
৪২	৩০	৪৩	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৮	৬	৭	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৪৬	৩৩	৩৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৭২	৬৪	৭৩	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
২৮	৩৬	২৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
১৩,২১০	১৮,৫২৪	২২,০৬৪	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
২৩	৪৩	৩৫	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৫২	৫৬	৬১	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
২৫	১	৫	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৬,০০০	৬,৫০০	৫,০০০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৪৬	৪৭	৪৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৮৫	৯২	৯৫	২০০১(প্রা.শি.অ)
৯০	৯৫	৯৪	২০০১(প্রা.শি.অ)
২,৪৬৪	৩,০২৫	২,৯৬৭	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
৯৯	৮৬	৯৯	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১২	১১	১১	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ পূর্বে সুন্দরবনের অবস্থানের জন্য সাতক্ষীরার প্রকৃতি ও পরিবেশ বিশেষ রূপ ধারণ করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

জলবায়ু	সমভাবাপন্ন
তাপমাত্রা	১৩° সে. - ৩৬° সে.
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৭৭% - ৮৬%
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত	প্রায় ১৫০০ মি. মি.

জলবায়ু : বিশেষজ্ঞ ভৌগোলিকদের মতে সাতক্ষীরা জেলার জলবায়ু দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জলবায়ুর ন্যায় একই রূপ হলেও কিছুটা স্থানীয় ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে ষড়ঋতুর পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এখানে গ্রীষ্ম আসে প্রচণ্ড দাবদাহ নিয়ে। এ সময় কাল বৈশাখীর তাণ্ডব, শিলাবৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং প্রায়শই বর্ষা লক্ষ্য করা যায়। বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠ-ঘাট, খাল-বিল, ডোবা-নালা পানিতে ভরে যায়। শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তকালে আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম থাকে। দক্ষিণাঞ্চলে বাতাস অত্যধিক আদ্র থাকে এবং সব জায়গায় আবহাওয়া কিছুটা অস্বাস্থ্যকর। এপ্রিল-মে মাসে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রায়ই ঝড় হয়।

এই জেলার আবহাওয়ায় চরমভাবাপন্নতা আছে। মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল এবং নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকাল। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ২৬°-৩৬° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে এবং শীতকালে তাপমাত্রা ১৩°-২৬° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতা ৭৭% - ৮৬% এর মধ্যে থাকে। বার্ষিক গড় প্রায় ১,৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত দেখা যায়।

নদী ও মোহনা : অতি প্রাচীনকালে সাতক্ষীরা অঞ্চল বিরাটাকায় জলাভূমি ছিল। নদী তীরবর্তী এলাকায় পানি সঞ্চিত হওয়ার ফলে ভূমি উঁচু হতে থাকে এবং বনভূমিতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে জঙ্গল কেটে জনবসতি গড়ে উঠে। সাতক্ষীরা জেলা এককালে প্রচুর নদ-নদী, খাল-বিল ও বাওড়ে পরিপূর্ণ ছিল, যার অনেকগুলো আজ নাব্যতা হারিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে পরিদৃষ্ট নদ-নদী ও খালগুলোর কোথাও কোথাও ভরাট হয়ে চাষাবাদ চলছে।

সাতক্ষীরা জেলার উপর দিয়ে গঙ্গা-পদ্মার বেশ কয়েকটি শাখা নদ-নদী বহুমুখী হয়ে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। সাতক্ষীরা জেলার প্রধান কয়েকটি নদী হল কপোতাক্ষ, ইছামতি, বেতনা, খোলপেটুয়া, সোনাই, কালিন্দী ও মরিচ্চাপ। নদীগুলোয় সারা বছরই পানি থাকে। সব মিলিয়ে নদ-নদীগুলো প্রায় ৪৯ বর্গ কি. মি. এলাকায় বিস্তৃত যা সমগ্র জেলার প্রায় ১%। নদীগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হল -

কপোতাক্ষ নদ : কপোতাক্ষ নদ যশোর জেলার চৌগাছা, ঝিকরগাছার ভিতর দিয়ে সাতক্ষীরা জেলার ত্রিমোহনী, সরসকাটি, ধানদিয়া, সরুলিয়া, পাটকেলঘাটা, তালা, জালালপুর, খেশরা, কপিলমুনি ও শেষে সেনপুরের নিকটে খুলনা জেলায় প্রবেশ করেছে এবং রাডুলির নিকট শিবশায় মিলিত হয়েছে। এটা খুলনা ও সাতক্ষীরা সীমান্ত চিহ্নিত করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছে।

ইছামতি : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণগঞ্জের কাছে মাথাভাঙ্গা নদীর একটি শাখা চুনি নাম ধারণ করে সীমান্ত ঘেষে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এই নদীই ইছামতি নাম ধারণ করে পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ অতিক্রম করে সর্বপ্রথম কলারোয়া উপজেলার চান্দুড়িয়া সীমান্ত স্পর্শ করে। কিছুদূর আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়ে পুনরায় ভারতের অভ্যন্তরে গোপালপুরে প্রবেশ করে। অতঃপর বাদুড়িয়া ও বশিরহাট হয়ে পুনরায় বাংলাদেশ সীমান্তের

সাতক্ষীরার রাধানগর, শাখরা, কোমরপুর, টাউন শ্রীপুর, ভাতশালার পাশ দিয়ে এসে কালিগঞ্জ উপজেলার বসন্তপুরের উত্তর সীমানা দিয়ে পূর্বমুখী হয়ে কালিগঞ্জে পুনরায় দক্ষিণামুখী হয়ে শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুরের নিকট যমুনা ও ইছামতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পরে যমুনা পশ্চিমদিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মাদার নামে সুন্দরবনে প্রবেশ করেছে এবং সাগরে পতিত হয়েছে। আর ইছামতি ঈশ্বরীপুরের পূর্বপাশ দিয়ে 'কদমতলী' নাম ধারণ করে মুন্সীগঞ্জ বরাবর কদমতলী বন অফিসের কাছে 'মালঞ্চ' নামে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

বেত্রাবতী বা বেতনা : এ নদী ভৈরবের একটি শাখা। এটা যশোর জেলার নাভারণ-বাঁগআচড়ার উপর দিয়ে প্রথমে কলারোয়া উপজেলার ইলিশপুর ভিখালীতে প্রবেশ করেছে। তারপর শাকদহ্, পানিকাউরিয়া, দিগং, হেলাতলা, শুভংকরকাটি, তুলশীডাঙ্গা, কলারোয়া পৌরসভার উপর দিয়ে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ঝাউডাঙ্গা, আখড়াকোলা, বিনেরপোতা, মাছখোলা হয়ে আশাশুনিতে 'বুধহাটার গাঙ' নামে পরিচিত হয়ে দক্ষিণে (কেয়ারগাতিতে) মরিচ্চাপের সাথে (মানিকখালিতে) মিলিত হয়েছে। এখান থেকে এক শাখা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বড়দলের উপর দিয়ে কপোতাক্ষে পড়েছে এবং অন্য শাখা দক্ষিণ দিকে 'খোলপেটুয়া' র সাথে মিশেছে।

খোলপেটুয়া : বেত্রাবতী ও মরিচ্চাপ নদী আশাশুনির মানিকখালিতে খোলপেটুয়া নাম ধারণ করেছে এবং ক্রমশ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ডানদিকে প্রবাহিত যমুনার ধারা কাঁকশিয়ালী-বাঁশতলা হয়ে পশ্চিম দিক থেকে গলঘেসিয়া নামে খোলপেটুয়ার সাথে মিশেছে। এই খোলপেটুয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে নওয়াবেকীর পাশ দিয়ে বুড়িগোয়ালিনীতে আড়পাংগাসিয়া নাম ধারণ করেছে এবং পার্শ্বেমারীর নিকটে কপোতাক্ষের সাথে মিলিত হয়েছে।

সোনাই : এই নদীর উৎপত্তি ইছামতি থেকে । ইছামতির শাখা কলারোয়া উপজেলার পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চান্দুড়িয়া-গোয়ালপাড়া থেকে বেরিয়ে সুলতানপুর, হিজলদি, দাড়কী, বড়ালী, চান্দা, রাজাপুর, ভাদিয়ালি ও কেড়াগাছি হয়ে সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় প্রবেশ করেছে। বর্তমানে এই নদীর অধিকাংশই মজে গেছে। এই নদী কেড়াগাছি হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের স্বরূপনগরের নিত্যানন্দকাটি, বালতি ও বয়ারঘাটা সংলগ্ন বৃহৎ বল্লীর বিলের ভিতর দিয়ে তেঁতুলিয়ায় ইছামতি নদীতে পুনরায় যুক্ত হয়েছে।

কালিন্দী : কালিগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম দিকে বসন্তপুরে যমুনা থেকে একটি শাখা সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। রাজা প্রতাপাদিত্যের সময় এই শাখা সাধারণ খালের মত ছিল। এই খাল 'কালিন্দী' নামে পরিচিত। ১৮১৬ সালে খনন করে এই খাল আরও দক্ষিণে কলাগাছির সাথে যুক্ত করা হয়। পরে প্লাবণে কালিন্দী বড় নদীতে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এটা রায়মংগলের মাধ্যমে সাগরে পড়েছে। এই নদী বর্তমানে বাংলাদেশ ভারতের সীমানা নির্দেশ করছে। উল্লেখ্য, কালিন্দীকে কলাগাছির সাথে যুক্ত করার আগে কালিগঞ্জে যমুনা থেকে একটি খাল কেটে পূর্বদিকে বাঁশতলা নদীর সাথে সংযুক্ত করা হয়। বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ইউলিয়াম কক্শাল এই খাল খনন করান। তার নামানুসারে এই খালের নাম হয় 'কাকশিয়ালী'। এই খালই বর্তমানে 'কাকশিয়ালী' নদী।

মরিচ্চাপ : এই নদী উত্তর দিক থেকে সাতক্ষীরা উপজেলার উপর দিয়ে এল্লাচর পৌঁছেছে। এই এল্লাচর থেকে বৃটিশ আমলে জমিদার প্রাণনাথ রায় চৌধুরী একটি খাল কেটে উত্তরের দিকে সাতক্ষীরা শহরের ভিতর দিয়ে থানাঘাটার নৌখালি খালের সাথে সংযোগ করেন। এটা 'প্রাণশায়ের খাল' নামে পরিচিত। এল্লাচর থেকে মরিচ্চাপ নদী ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্বমুখী অগ্রসর হয়ে আশাশুনি উপজেলায় প্রবেশ করেছে। এটা চলার পথে আশাশুনির মানিকখালিতে বেত্রাবতী নদীর সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটছে। এই মিলিত প্রবাহের নাম 'খোলপেটুয়া'।

অন্যান্য নদী : সালতা নদী, শালিকা, মাদার নদী, সেনাকুড়, মীরগাং, চুনার নদী, হামকুড়া ও কোদালশা নদী প্রভৃতি।

মাটি : সাতক্ষীরা মূলত পলি বিধৌত সমভূমি। এই সমভূমির মাটি বালি মিশ্রিত এবং মোটামুটি উর্বর। ভূমির সংগঠনের দিক থেকে এ জেলার মৃত্তিকা উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল - এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তরাঞ্চলের মাটি দো'আশ এবং পলিবহুল। সেখানে ধান, পাট, শাক-সবজি ইত্যাদির চাষ ভাল হয়ে থাকে। এই এলাকাকে প্রাচীন উঁচু ভূমি বলা যেতে পারে। আর যমুনা, ইছামতি, খোলপেটুয়া এবং কপোতাক্ষের তীরবর্তী দক্ষিণাঞ্চলের মাটি লোনা এঁটেল। বিশেষ করে আশাশুনি, শ্যামনগর, তালা এবং কালিগঞ্জ উপজেলার কিছু অংশের মাটি লোনা এঁটেল। জোয়ার-ভাটার জন্যে সামুদ্রিক পানি দক্ষিণাঞ্চলের নদী ও খালগুলোয় প্রবাহিত হয় বলে সেখানে মাটিতে লবণাক্ততার ভাগ বেশি। ষাটের দশকে দক্ষিণাঞ্চলের নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করার ফলে ধান ও অন্যান্য ফসলাদির চাষাবাদ সম্ভব হয়েছে।

ভূ-প্রাকৃতিক দিক দিয়ে সাতক্ষীরা জেলায় প্রধানত দুই ধরনের ভূ-প্রকৃতি দেখা যায় - লবণাক্ত গাঙ্গেয় কটাল পলল ভূমি যা হালকা বাদামী বর্ণের এবং এঁটেল দো-আঁশ মাটি যা ধূসর বর্ণের মাটি। প্রথম ধরনের মাটি জেলার উত্তরাংশে এবং দ্বিতীয় ধরনের মাটি জেলার দক্ষিণাংশে দেখা যায়। জেলার পশ্চিমাঞ্চলে পীট মাটির একটি স্তর দেখা যায়। এই জেলায় এটেল ভাবাসম্পন্ন মাটির জমির পরিমান ৬৫,৬৭৪ হেক্টর, এটেল দোঁআশ মাটিযুক্ত জমি ৬৮,২৯৬ হেক্টর, বেলে দোঁআশ মাটি ৩৮,০২৮ হেক্টর এবং বেলে মাটিযুক্ত জমি ১৯,৫৫৮ হেক্টর। মাটিতে কিছু পরিমাণ লবণাক্ততা আছে। জেলায় সর্বোচ্চ ১৫ পিপিএম লবণাক্ততা দেখা যায়। যা এই এলাকার ফসলের প্রকৃতি ও উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে।

সাগর : জেলার দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর ভূ-প্রকৃতি ও মানুষের জীবন জীবিকাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সাগরের প্রভাবের উপর ভিত্তি করেই এই জেলায় গড়ে উঠেছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম সুন্দরবন । বিচিত্র ধরনের জীব ও সম্পদের সমাবেশ সাগরের লোনা পানি ও বেলাভূমিতে। জেলার অনেক মানুষই এ সম্পদ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

বনভূমি : জেলার মোট বনভূমির পরিমাণ ১৬৪,৫২৫ হেক্টর (বি.বি.এস, ২০০১)। এই জেলায় সুন্দরবনের একটি বড় অংশ অবস্থিত। সুন্দরবন, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম, সাতক্ষীরা জেলায় বিস্তৃত। এই বন প্রতিবেশি দুটি দেশ বাংলাদেশে ও ভারতের মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশ অংশে এই বনের আয়তন ৬০১৭ বর্গ কি.মি. যা মোট আয়তনের ৬২%। এই বন সাতক্ষীরা, খুলনা এবং বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ৭৮% অংশ জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত।

সুন্দরবনে ২৪৫ বর্গের প্রায় ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যায়। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি উদ্ভিদ হল সুন্দরী, গেওয়া, কেওরা, পশুর, কাকড়া, বাইন, গোলপাতা, ধুন্দুল ও গড়ান। এ ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদ হল - হরগোজা, টাইগার ফান, ধল চাকা, খলশি, আমুর, বন ঘাস, সুন্দরী লতা, সিঙ্গরা, গাব, বন জাম, নল ঘাস, বন বকুল, বন লিচু, কিরপা, ধানশি, হেতাল, নল খাগড়া, করমচা, ঝানা ও ছৈলা ইত্যাদি।

এই বনে ৪৫৩ প্রজাতির প্রাণী দেখা যায়। ১২০ প্রজাতির মাছ, ২৯০ প্রজাতির পাখি, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৮ প্রজাতির উভচর প্রাণী দেখা যায়। সুন্দরবন বিশ্ব বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সর্বশেষ আবাসস্থল। সর্বশেষ বাঘ শুমারী অনুযায়ী দেখা যায় এই বনে প্রায় ৪১৮টি বাঘ আছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রাণী হল চিত্রা হরিণ, বানর, বুনো শুয়োর, উদবিড়াল, কাঠবিড়ালী ইত্যাদি।

সুন্দরবনের নদ-নদী, খাল, খাড়িতে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক, মোহনা ও মিঠা পানির মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - টুটা হাঙ্গর, কালো হাঙ্গর, পীতাম্বরী, শাপলাপাতা, চাপিলা, চন্দনা, ফ্যাসা, কাটা ফ্যাসা, কুটিয়া, শিলং, কাটা মাছ, সাগর মাগুর, কাউন মাগুর, টিকটিকি মাছ, লইট্যা মাছ, একঠোটিয়া, বংশী মাছ, গোরা মাছ, চান্দা, তুলার ডাণ্ডি, পাখাম মৌরী, জেরা মৌরী, চাঁপা করি, রাঙ্গা চইক্যা, রূপবাম, সোনাবাম, দাতিনা, পোয়া, কালো পোয়া, সোলী বাটা, পান মাছ, বিষতারা, ভাঙন, কোরাল, কোড়ল, তারা, গজার, কুলি, চেউয়া, বাইলা, লাল চেউয়া, জুটি মাছ, রঙ্গিলা, চম্পা, মাইচ্যা ও পোটকা ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার কচ্ছপ, হাঙ্গর, বিভিন্ন প্রজাতির ডলফিন, কুমীর ও সাপ দেখতে পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য : জেলার জলবায়ু ও মাটির ধরন এখানকার উদ্ভিদ ও জীব জগতে বৈচিত্র্য এনেছে। জেলার উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেয়া হলো।

উদ্ভিদ : বাড়ীতে জন্মানো গাছের মধ্যে আম, গাব, জাম, তাল, তেতুল, কাঁঠাল, জলপাই, বেল, চালতা, বরই, পেয়ারা, লিচু, কামরাঙ্গা, আতা, হরিতকী, আমলকি অন্যতম। এ ছাড়া অনেক লোকই বাদাম ও কলাগাছ লাগিয়ে থাকে।

স্থানীয় গাছের মধ্যে কড়ই, শীল কড়ই, গর্জন, জারুল ও শিমূল অন্যতম। এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতের বিদেশী গাছ যেমন টিক, মেহগনি, শিশু রাস্তার পাশে ও বাড়িতে লাগানো হয়ে থাকে। এ ছাড়া প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই মান্দার নামের এক প্রকার কাঁটাওয়ালা গাছ বেড়া ও জ্বালানির জন্য লাগানো হয়। বর্তমানে ইউক্যালিপটাস ও পাইন গাছও লাগানো হচ্ছে।

এই জেলায় পাম জাতীয় গাছ প্রচুর জন্মে থাকে। জেলার উত্তরে ও পশ্চিমে সুপারি গাছ প্রচুর জন্মে থাকে। নারিকেল গাছ সারা জেলায় জন্মে। তাল ও খেজুর গাছ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। এই জেলায় বিভিন্ন জাতের বেত, বাঁশ ও ছন জন্মে। এখানে উল্লেখ্য যে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় এ জেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, এলজিইডি, বন বিভাগসহ বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক ২০০৩-২০০৪ সালে ব্যাপক আকারে নারিকেল চারা রোপন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

যা হোক, সাতক্ষীরা জেলায় কৃষিজ উদ্ভিদের মধ্যে ধানই প্রধান। এ ছাড়া পাট ও সীমিত আকারে কিছু কিছু সরিষা, তামাক ও আখের চাষ করা হয়। কোনো কোনো এলাকায় বেগুণ, সীম, মূলা, কপি, আলু, বরবটি, ঢেড়শ, কুমড়া, লঙ্কা ইত্যাদি সবজি ও নানা জাতীয় ছোট ডাঁটা জাতীয় শাকের প্রচুর চাষ হয়। উত্তরাঞ্চলে সরিষা ও কলাই প্রচুর জন্মে। এ অঞ্চলে ওল ও কচুর যথেষ্ট সুখ্যাতি এখনও আছে।

গ্রামীণ আবাদযোগ্য উদ্ভিদের মধ্যে নারিকেল, সুপারি, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, বেল, কুল, পেয়ারা, আতা, কলা পেঁপে প্রধান। দক্ষিণাঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চলে আম, কাঁঠাল, কুল ও পেয়ারার ফলন বেশি। সাতক্ষীরার কুল ও ওল বাংলাদেশ বিখ্যাত। জেলার সর্বত্র লেবু ও খেঁজুর গাছ দেখতে পাওয়া যায়। যশোর ও সাতক্ষীরা অঞ্চলের খেঁজুরের গুড় ও নলেন পাটালির সুখ্যাতি সারা দেশব্যাপী। উত্তরাঞ্চলে কোথাও কোথাও বিস্তীর্ণ বাঁশ বাগান ও সারিবদ্ধ তালগাছ পরিলক্ষিত হয়। আম, জাম, গাব, জামরুল, গোলাপ জাম ও লিচু গাছও প্রচুর রয়েছে। বড় গাছের মধ্যে (বনজ ব্যতীত) বাবলা, দেবদারু, খই, আম, জাম, তেঁতুল, বট, শিমূল, বেল প্রধান। কালীগঞ্জ উপজেলার কুশলিয়া ও মৌতলায় প্রচুর আনারস, লিচু ও কাঁঠাল জন্মে। তালা উপজেলার কানাইদিয়াতেও আনারস জন্মে।

প্রাচীন গ্রামীণ বনফুলের মধ্যে ধুতুরা, আকন্দ, জলজ শাপলা, চিতে, বাশবরণ, ফনিমনসা উল্লেখযোগ্য। । জেলার দক্ষিণাঞ্চলে গাছপালা তত ঘন নয়। বিল অঞ্চলে জলজ উদ্ভিদ লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কোথাও মেলে ও হোগলা বন দেখা যায়। এগুলো দিয়ে পাটি ও বিছানা তৈরি হয়। নদী-নালার তীরে কোথাও কোথাও কেওড়া, ওড়া ও গোলপাতা গাছ পরিলক্ষিত হয়।

প্রাণী : বিশ্ববিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনের অন্যতম আকর্ষন। এই জেলায় প্রচুর বন্য প্রাণী দেখা যায়, যেমন খেকঁশিয়াল, বুনো শুয়োর, শজাড়ু, উদ বিড়াল, বন বিড়াল, গেছো বিড়াল প্রভৃতি সারা জেলায় কম বেশি দেখা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার পাখি যেমন সারস, হাঁস, কাক, কুন, চড়ুই, কোকিল, মাছরাঙ্গা, বুলবুল, তোতা, লেজঝোলা প্রভৃতি দেখা যায়।

এই জেলার বিভিন্ন নদ-নদীতে ভেটকি, ভাঙ্গন, পাঙ্গাস, চিতল, বোয়াল প্রভৃতি মাছ দেখা যায়। এ ছাড়া পুকুর, বিল ও চিংড়ি ঘেরগুলোয় বিভিন্ন প্রকার চিংড়ি, কালি বাউশ, রুই, কাতল, মৃগেল, বোয়াল, শোল, কই, মাগুর, ভেটকি ভাঙ্গন, টেংরাসহ বিভিন্ন মাছ পাওয়া যায়।

সারা দেশের মতো এখানেও প্রায় সব ধরণের পাখীই দেখা যায়, যাদের মধ্যে শকূন, বাজ, গাংচিল, চিল, কানি বগা, গো বগা, কালা বগা, কাক, মাছরাঙ্গা অন্যতম। বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস আছে। এ ছাড়াও জলচর পাখী যেমন পানকৌড়ি, ডাহুক, কোরা, পিটালী, রাজহাঁস অন্যতম। এদের পাশাপাশি এই জেলায় দোয়েল, কোকিল, হলদি পাখী, ফিঙ্গে, ময়না, শালিক, বুলবুল, টুনটুনি, শ্যামা, বাবুই, কবুতর ও ঘুঘু দেখা যায়। শীতকালে এই জেলায় প্রচুর অতিথি পাখী আসে।

বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছও এই জেলায় পাওয়া যায়। সহজপ্রাপ্য মাছগুলো হল রুই, কাতল, মৃগেল, কালবাউশ, আইড়, টেংরা, মাগুর, শিং, শোল, বোয়াল, গজাড়, পাবদা, কই, মুড়লা, পুটি, বাইন এবং চেলা। এদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার কার্প জাতীয় মাছ, তেলাপিয়া, নাইলোটিকা প্রভৃতি পুকুর ও দীঘিতে চাষ করা হয়।

সাগরে রয়েছে অফুরন্ত জীব বৈচিত্র্য। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন রূপালী ও সাদা রূপচান্দা, লইট্যা, ছুরি, পোয়া, সাদা দাতিনা, তুল্লার ডান্ডি, বাটা, ফানসা, গুইচ্চা, ভেটকি , লাল পোয়া, চাপাকড়ি, চম্পা, সারডিন, বম মাইট্টা ও বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি যেমন বাগদা, বাঘতারা, ডোরাকাটা, চাগা, বাঘাচামা, ইরিনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সাগর তীরের অগভীর জলে রয়েছে নানা প্রজাতির জীব যেমন শামুক, ঝিনুক, কস্তুরা বা ওয়েস্টার, কাঁকড়া, লবষ্টার, শৈবাল বা সী উইড, সামুদ্রিক শসা এবং শিরোপদী । এ ছাড়া সাগর উপকূলে নানা প্রজাতির স্পঞ্জ, জেলী মাছ ও প্রবাল রয়েছে।

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে মোট আবাদকৃত জমির ১৯% উচুঁ জমি, ৬৭% মাঝারি এবং ১৪% নীচু জমি। জেলার অধিকাংশ এলাকায় মাঝারি ও নীচু জমিতে বর্ষাকালে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

প্রধান ফসল : জেলার অর্থনীতিতে কৃষি কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ১ লাখ ৫৮ হাজার হেক্টর জমিতে কৃষি কাজ করা হয়ে থাকে, যা সমগ্র জেলার ৫১%। জেলার প্রধান ফসল ধান (প্রায় ৭৯% জমিতে ধান চাষ করা হয়ে থাকে) এবং বোরো, আমন ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট, আলু, গম, সবজি, বিভিন্ন প্রকার ডাল, মরিচ ও আখ অন্যতম। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শস্য নিবিড়তার মান ১৪২, যা উপকূল অঞ্চল ও বাংলাদেশের শস্য নিবিড়তার তুলনায় অনেক কম।

কৃষি জমির ব্যবহার

উচ্চ ফলনশীল জাতের আউশ	৩.৯৯%
উচ্চ ফলনশীল জাতের আমন	৩৬.০৮%
উচ্চ ফলনশীল জাতের বোরো	১৭.২৮%
স্থানীয় জাতের ধান	২২.০৩%
গম	২.৩৩%
আলু	৩.২৮%
সবজি	১.৯১%
মসলা	১.৬২%
ডাল	২.৪১%
তেল বীজ	৩.৪০%
আখ	০.৮৪%
পাট	৪.৭৩%

পশু সম্পদ : সাতক্ষীরায় ৪৯% গ্রামীণ বাড়িতে গবাদিপশু আছে এবং বাড়ি প্রতি গবাদিপশুর পরিমাণ গড়ে ২.৭৯। এই হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে বেশি।

নদী-সাগরের মাছ : সাতক্ষীরাতে অভ্যন্তরীণ নদ-নদী ও পুকুর থেকে প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরা হয়, যা একদিকে যেমন লোকের খাদ্যের মান বজায় রাখতে সাহায্য করে তেমনি জেলার অর্থনীতিতেও অবদান রাখে। ২০০১-০২ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, জেলার নদ-নদী, মোহনা ও জলাভূমি থেকে প্রায় ৪ হাজার মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়েছে, যা উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ২%। এ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণ লোক সামুদ্রিক মাছ ধরেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও সুন্দরবন। এই সুন্দরবনের ভিতরস্থ নদ-নদী ও বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জাতের মাছ ধরা হয় এবং তা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ ছাড়াও বিদেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন জাতের মাছের মধ্যে সাধারণত রুই, কাতল, মৃগেল, শোল, বোয়াল, বেলে, চ্যাং, বাটা, কাল বাউস, পুটি, সরপুটি, কই, মাগুর, ট্যাংরা, চিংড়ি ইত্যাদি মিঠা পানিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া কাকড়া, কচ্ছপ, কুঁচে প্রভৃতি জলজ প্রাণী পুকুর, নদী, খাল ও জলাশয়ে দেখতে পাওয়া যায়। আর দক্ষিণাঞ্চলের লোনা পানিতে বিভিন্ন জাতের মাছ যেমন ভেটকী, ভাগন, পারশে, দাতনে, পাঙাশ, কাইন, ট্যাপা, ট্যাংরা এবং গলদা ও বাগদাসহ নানা জাতীয় চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়।

মাছ চাষ : ২০০১-০২ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, জেলার পুকুরগুলো থেকে প্রায় ৬ হাজার মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে (উপকূলের প্রায় ২%)। যদি সংস্কারযোগ্য পুকুরগুলোকে মাছ চাষের আওতায় আনা যায় তবে উৎপাদনের পরিমাণ আরো বাড়বে।

সাতক্ষীরা অঞ্চল এক কালে প্রচুর নদ-নদী, খাল-বিল-বাওড়ে পরিপূর্ণ ছিল, যার অধিকাংশ আজ নাব্যতা হারিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে এখানকার নদী-খালসহ পশ্চাৎভূমির বিল এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মিঠা পানির গলদা চিংড়ির চাষ শুরু হয়েছে।

মাছ চাষ, পোনা উৎপাদন এ অঞ্চলের এক প্রাচীন ঐতিহ্য। এ অঞ্চলের পোনা উৎপাদনকারীরা সত্তর দশকের আগ পর্যন্ত প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ করে নার্সারীতে প্রতিপালন করে বিক্রি করত। পরবর্তীতে সরকারি খামারে হ্যাচারীতে রেণু উৎপাদনের সফলতা দেখে এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে বেসরকারিভাবে স্থানীয় লোকেরা হ্যাচারী স্থাপনের কাজে এগিয়ে আসেন এবং আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সাতক্ষীরা এলাকায় হ্যাচারী স্থাপিত হতে শুরু করে। বর্তমানে এ জেলায় ৪৯টি হ্যাচারী স্থাপিত হয়েছে, যার বার্ষিক রেণু উৎপাদন ক্ষমতা ৬৪২০ লক্ষ এবং পোনা উৎপাদনের জন্য স্থাপিত নার্সারীর সংখ্যা ৯৫টি।

১৯৮৫ সাল থেকে এ অঞ্চলে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। তবে সনাতন পদ্ধতির চিংড়ি চাষ ব্যবস্থা বহুকাল আগে থেকেই সাতক্ষীরা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। স্থানীয় ভাষায় চিংড়ি খামারকে ঘের বলা হয়। বর্তমানে এ জেলায় প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করা হয়।

দুর্যোগ

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস : ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য সাতক্ষীরা জেলা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। এই জেলার বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন শ্যাম নগর ও আশাশুনি উপজেলার ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকির মধ্যে অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরে প্রধানত দুটি ভিন্ন প্রকারের সাইক্লোন হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাইক্লোন ও অপরটি হচ্ছে মৌসুমী নিম্নচাপ। সাইক্লোনের সময় বাতাসের গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২৪০ কি.মি. পর্যন্ত উঠতে পারে। এর সাথে ৬ থেকে ৭ মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস এবং তীব্র বৃষ্টিপাতও দেখা যায়। এ ছাড়া এই জেলার অনেক লোক সমুদ্রে ও সুন্দরবনে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে, যারা জীবনরক্ষাকারী উপকরণ ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার অভাবে অধিক ঝুঁকির মুখে থাকে। তবে দক্ষিণে সুন্দরবনের অবস্থানের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়ে থাকে।

আর্সেনিক : বি.জি.এস. ও ডি.পি.এইচ.ই.-র একটি গবেষণা (২০০১) থেকে দেখা গেছে যে, সাতক্ষীরা জেলার নলকূপগুলোয় আর্সেনিকের গড় মাত্রা ১৩৩ মাইক্রোগ্রাম/লিটার। সমীক্ষাটিতে আরো দেখা গেছে যে নলকূপগুলোর মধ্যে ৬৭ শতাংশেই আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের চেয়ে বেশি, যা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি।

জলাবদ্ধতা : ষাটের দশক থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ড লোনা পানির হাত থেকে ফসলী জমি বাচানোর জন্য জেলার নদীগুলোর ধারে বাঁধ দিয়ে সমগ্র জেলাকে কয়েকটি পোল্ডারে রূপান্তরিত করে। এই পোল্ডার তৈরির ফলে বহু নদীতে জোয়ার-ভাটার স্রোত কমে যায়। ফলশ্রুতিতে প্রবাহমান নদীগুলোর অধিকাংশের নাব্যতা হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমানে অনেক নদীর প্রবাহ নেই বললেই চলে। ইতোমধ্যেই জেলার কিছু কিছু এলাকায় স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। আশংকা হচ্ছে এই প্রবনতা অব্যহত থাকলে পুরো সাতক্ষীরাতেই স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হবে।

বন্যা : বন্যার সাথে এ দেশের মানুষের পরিচয় প্রাচীনকাল থেকে। বন্যা বারবার মারাত্মকভাবে বিপর্যয় ঘটিয়েছে আমাদের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য অবকাঠামোতে। অনেকবার বন্যা ডেকে এনেছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। উল্লেখ্য ১৮৭১, ১৮৮৫, ১৯০০, ১৯৭০, ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮১, ১৯৮৮, ১৯৯৮,২০০০ এবং সর্বোপরি ২০০৪ সালের বন্যায় এদেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। ২০০০ সালের শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় সাতক্ষীরা জেলায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। অসংখ্য জান মাল ও ফসল বিনষ্ট হয়।

সীমান্ত জেলা হবার কারণে ভারতে বন্যার সৃষ্টি হলে সাতক্ষীরা জেলায় ঢল বা বন্যার সৃষ্টি হয়। ২০০২, ২০০৩ ও ২০০৪ সালে সাতক্ষীরা জেলায় ব্যাপক বন্যা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক নদী ইছামতি, সোনাই থেকে ভারতীয় ভূ-খণ্ডে সৃষ্ট ঢল সাতক্ষীরায় প্রবেশ করে। আবার ভারতীয়রা অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য অনেক সময় স্লুইস গেট খুলে দেয়, যার ফলে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি হয়।

খরা : সাতক্ষীরা জেলার কৃষকদের জন্য খরা একটি বড় সমস্যা। এই জেলা তীব্র ও মাঝারী খরায় আক্রান্ত হয়ে থাকে যার ফলে রোপা আমন ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই জেলার মাটি এমনিতেই লবণাক্ত। তার ওপর চিংড়ি ঘের করার ফলে লবণাক্ততা বাড়ছে। তাই পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হলে ফসল বিনষ্ট হয় এবং মাটি চাষের উপযুক্ত হয় না।

নদী ভাঙন : নদী ভাঙন একটি বড় সমস্যা। প্রতি বছর শত শত একর জমি নদীবক্ষে বিলীন হয়ে যায়। খোলপেটুয়া, মালঞ্চ, কাকশিয়ালী, কালিন্দি ও ইছামতি নদীতে ভাঙনের ফলে জেলার লোকজন বিপদের সন্মুখীন হচ্ছে।

বন উজাড় : বনদস্যু ও বিভিন্ন বাহিনীর উপদ্রবের ফলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে শত শত একর বনভূমি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর ও বন বিভাগের দুর্বল ব্যবস্থাপনার ফলে সুন্দর বন থেকে প্রতি দিনই অবৈধভাবে কাটা হচ্ছে গাছ, গোলপাতা; শিকার করা হচ্ছে বাঘ, হরিণ, মাছ প্রভৃতি।

পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া : এই জেলায় কৃষি জমির একটি বড় অংশ ভূ-গর্ভস্থ পানি দিয়ে সেচ দেয়া হয়। খরা ও অনাবৃষ্টির ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যায়। গত দশ বছরে পানির স্তর অন্তত ১১ থেকে ১২ ফুট নেমে গিয়েছে। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ১২ থেকে ১৪ ফুটের মধ্যে পানির স্তর পাওয়া যেত। এখন সেটা ২৪ ফুটেও মিলছে না। এই হার অব্যহত থাকলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হওয়ার আশংকা রয়েছে।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা শব্দটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং সেই নেতিবাচক ঘটনার সাথে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকে বুঝিয়ে থাকে। বিপদাপন্নতার ধরণ, প্রকার ও ব্যপ্তিতে ভিন্নতা আছে। সব রকম বিপদাপন্নতা দ্বারা যেমন জেলার সব এলাকা আক্রান্ত হয় না, তেমনি সব পেশার, সব শ্রেণীর মানুষও সমানভাবে বিপদাপন্ন হয় না। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের বিপদাপন্নতার উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় (সিইজিআইএস, ২০০৪) দেখা যায় যে, সাতক্ষীরা জেলার মানুষ প্রাকৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক কারণে বিপদাপন্ন হয়। সাতক্ষীরা জেলার ক্ষুদ্র কৃষকেরা লবণাক্ততা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, জলবায়ু পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড়, নিরাপদ পানীয়-জলের অভাব, কৃষি জমির অভাব, মাছের রোগ, কৃষি উপকরণের উচ্চ মূল্য, ঋণ সুবিধার অভাব, যৌতুক প্রথা প্রভৃতি কারণে প্রধানত বিপদাপন্ন হয়। জেলেদের ক্ষেত্রে মাছের রোগ, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, নদী ভরাট, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নির্বিচারে মাছ ধরা, অবৈধ মাছ ধরা, নগদ অর্থের অভাব, দাদন, মাছ বাজারজাতকরণের সমস্যা প্রভৃতি প্রধান বিপদাপন্নতা হিসেবে দেখা দেয়। অপরদিকে গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকরা কৃষি জমির অভাব, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, বছরব্যাপী কাজের সুযোগের অভাব, নারী শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি ও নিরাপত্তার অভাব, পুষ্টিহীনতা, সুষ্ঠু পয়: নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, সুষ্ঠু গৃহায়ণের সমস্যা, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ঋণ সুবিধার অভাবের কারণে বিপদাপন্ন হয়।

সাতক্ষীরা জেলার নির্বাচিত কিছু পেশাজীবীদের বিপদাপন্নতা

ক্ষুদ্র কৃষক	লবণাক্ততা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, জলবায়ু পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড়, নিরাপদ পানীয়-জলের অভাব, কৃষি জমির অভাব, মাছের রোগ, কৃষি উপকরণের উচ্চ মূল্য, ঋণ সুবিধার অভাব, যৌতুক প্রথা, ইত্যাদি।
জেলে	মাছের রোগ, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, নদী ভরাট, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নির্বিচারে মাছ ধরা, অবৈধ মাছ ধরা, নগদ অর্থের অভাব, দাদন, মাছ বাজারজাতকরণের সমস্যা ইত্যাদি।
গ্রামীণ শ্রমিক	কৃষি জমির অভাব, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, বছরব্যাপী কাজের সুযোগের অভাব, নারী শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি, পুষ্টিহীনতা, সুষ্ঠু পয়: নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি।
শহুরে শ্রমিক	সুষ্ঠু গৃহায়ণের সমস্যা, সুষ্ঠু পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার অভাব, বছরব্যাপী কাজের সুযোগের অভাব, নিম্ন মজুরি, ঋণ সুবিধার অভাব ইত্যাদি।

উৎস: সিইজিআইএস, ২০০৪

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

সাতক্ষীরা জেলার মোট জনসংখ্যা ১৮.৪৫ লাখ। যার মধ্যে ৯.৩৬ লাখ পুরুষ এবং ৯.০৮ লাখ নারী। লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৩। মোট জনসংখ্যার ৯৩% লোক গ্রামে বাস করে। জেলায় মোট খানা / পরিবারের সংখ্যা ৩.৯ লাখ। প্রতিটি খানার গড় আকার ৪.৭ জন, যা উপকূলীয় অঞ্চলের গড়ের তুলনায় অনেক কম। সাতক্ষীরা জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪৭৮ জন লোক বাস করে যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের তুলনায় অনেক কম। সাতক্ষীরা সদর ও কলারোয়া উপজেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব সব চেয়ে বেশি।

শহুরে জনগণ (লাখ)	১.৩৩
পুরুষ	০.৬৭
নারী	০.৬৬
গ্রামীণ জনগণ (লাখ)	১.৭১
পুরুষ	০.৮৭
নারী	০.৮৪
লিঙ্গ অনুপাত	১০০:১০৩
নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত	০.৮২
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	৪৭৮

জেলার মোট জনসংখ্যার ৩৮% ০ - ১৪ বছর বয়সী, যা উপকূলীয় অঞ্চলের হারের তুলনায় অনেক কম। অপরদিকে ৭% লোকের বয়স ৬০ বছরের উর্ধ্বে। তাই বয়সগত দিক দিয়ে এই জেলার জনগণের নির্ভরশীলতার অনুপাত ০.৮২, যা উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় কম।

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী মাত্র ৭ শতাংশ লোক শহরাঞ্চলে বাস করে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে বাসকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ০.৫২%। শহর ও গ্রামের জনগণের মধ্যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য দেখা যায়।

নৃ-গোষ্ঠী : সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও তালা উপজেলার কিছু গ্রামে মুন্ডা নৃ-গোষ্ঠী বাস করে। তাদের পূর্ব পুরুষরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছিলো। তারা জমিদারদের অধীনে সুন্দরবন থেকে গাছ কাটতো এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে ধানসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করতো; তবে তাদেরকে জমির কোনো মালিকানা দেয়া হতো না। কিন্তু তাদের সরলতা ও অজ্ঞতার ফলে পূর্বপুরুষের ভিটা মাটির অনেকাংশই হাতছাড়া হয়ে গেছে। বর্তমানে তারা খুবই দরিদ্র অবস্থার মধ্যে আছে। শিক্ষিতের হারও অনেক কম, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকারী বা এনজিও উদ্যোগও খুব সীমিত।

জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই জেলায় ১টি সদর হাসপাতাল ও ৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে। হাসপাতালগুলোয় মোট শয্যার সংখ্যা ২৮০টি এবং শয্যাপ্রতি জনসংখ্যার অনুপাত ৬,৫৯৫। এই হার উপকূলীয় অঞ্চলের হারের চেয়ে অনেক বেশি, যা স্বাস্থ্য সেবার দুরবস্থার কথা তুলে ধরে। যদিও ১১টি বেসরকারী হাসপাতাল ও ৯টি গ্রামীণ ডিসপেনসারি আছে, কিন্তু তাদের সেবার পরিমাণ যথেষ্ট নয়।

শিশু স্বাস্থ্য : এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৭ এবং পাঁচ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৮৭। ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ২% অপুষ্টির শিকার। এই হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে কম। অপরদিকে, ৮৮%, ৭৫% এবং ৯৭% শিশু যথাক্রমে হাম,

নির্ভরশীলতার অনুপাত	০.৮২
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৫৭
অপুষ্টির মাত্রা	২%

ডিপিটি এবং পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে। এই হার সমগ্র বাংলাদেশের গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। জেলার ৩৯% ঘরে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার রয়েছে।

পানি, পয়ঃ ও বাসস্থান সুবিধা : ১৯৯১ সালের আদম শুমারী থেকে দেখা যায় যে, সাতক্ষীরা জেলার ১০% ঘরের দেয়াল ইট বা টিনের তৈরি। এই হার উপকূলীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম। আবার জেলার ৩৭% ঘরের ছাদ ইট বা টিনের তৈরি। এই হারও উপকূলীয় গড়ের তুলনায় কম। অপরদিকে ২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী দেখা যায় যে, ৩% ঘর ট্যাপের এবং ৭৭% ঘর টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে। এ ছাড়া ৪% ঘর গভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল। পুকুর ও অন্যান্য উৎসের পানি ১৬% ঘরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাতক্ষীরা জেলার লোকেরা সমগ্র উপকূলের তুলনায় ট্যাপ ও টিউবওয়েলের পানির সুবিধা বেশি পেয়ে থাকে। তবে আর্সেনিকের মারাত্মক প্রকোপ জেলার লোকদের বিপদগ্রস্ত করেছে।

একই হিসাবে আরো দেখা যায় যে ১৯% লোকের কোনো প্রকার পায়খানার সুবিধা নেই, যা সমগ্র উপকূলের তুলনায় খারাপ অবস্থা নির্দেশ করে। ৩৬% পনিবার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে।

শিক্ষা

সাতক্ষীরা জেলায় শিক্ষিতের হার ৪৫%। এই হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে কম। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার (৩৯%), পুরুষদের (৫১%) তুলনায় কম। এই হারও উপকূলীয় গড়ের চেয়ে কম। অপরদিকে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৪৭%। আশাশুনিতে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে কম এবং দেবহাটায় শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশি।

শিক্ষিতের হার (৭^{+})	
মোট	৪৫%
পুরুষ	৫১%
মহিলা	৩৯%
শিক্ষিতের হার (১৫^{+})	
মোট	৪৭%
পুরুষ	৫৬%
মহিলা	৩৮%

এই জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৩১১টি, যার মধ্যে ৬২২টি সরকারী। এই বিদ্যালয়গুলোয় মোট ২.৫ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে, যার মধ্যে অর্ধেকই মেয়ে। এই জেলায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের ভর্তির গড় হার ৯২%, যা উপকূলীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু অপরদিকে শিক্ষক প্রতি ছাত্রের অনুপাত (৪৮) উপকূলীয় গড়ের (৫০) চেয়ে কম এবং জনসংখ্যা অনুপাতে বিদ্যালয়ের ঘনত্বও অনেক বেশি (প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য ৭.১ টি)। এ জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৪৩টি এবং এতে প্রায় ১.০ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। যার মধ্যে ৪৮% ছাত্রী। জেলায় মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ১৬৮টি এবং মোট ৩৭ হাজার ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশুনা করে। এ জেলায় মোট ৪০টি কলেজ আছে যেখানে প্রায় ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৩১১ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৪৩ টি
মাদ্রাসা	১৬৮ টি
কলেজ	৪০ টি

অভিবাসন

বি.বি.এস, ১৯৯১ এর সূত্রানুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬% সাতক্ষীরার বাইরে থেকে আগত।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর বয়সী), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় এলাকার সামাজিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সাতক্ষীরা জেলা সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে নেই।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আয় : সাতক্ষীরা জেলার মোট আয় ৩০৬ কোটি টাকা (১৯৯৯/২০০০), যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মোট আয়ের প্রায় ৪.৫%। জেলাগত মোট আয়ের দিক থেকে এই জেলা উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে ৮ম স্থানে আছে। জেলার মোট আয়ের ৪৪%ই আসে চাকরি বা সেবামূলক খাত থেকে। আয়ের ৩৮% কৃষিখাত থেকে আসে, যা উপকূলীয় হারের চেয়ে অনেক বেশি। অপরদিকে আয়ের মাত্র ১৮% শিল্পখাত থেকে এসে থাকে। সাতক্ষীরা জেলায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৬ শতাংশ হারে হচ্ছে, যা উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমগ্র বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি। সাতক্ষীরা জেলায় মানুষের মাথাপিছু আয় মাত্র ১৬,০৭৭ টাকা (১৯৯৯/২০০০), যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের চেয়ে অনেক কম। মাথাপিছু আয়ের দিকে এই জেলা উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে ১০ম স্থানে এবং সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে ২৫তম স্থানে আছে।

সক্রিয় জনশক্তি : ১৯৯৯-২০০০ সালের শ্রমশক্তি জরীপ অনুযায়ী দেখা যায় যে, এই জেলায় মোট কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ৬.৬ লাখ এবং এর মধ্যে ৪৫%ই মহিলা। অপরদিকে দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে মোট কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ৪২ হাজার, যা জেলার মোট সংখ্যার ৬%।

প্রধান জীবিকা দল

কৃষক : কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে, গ্রামীণ জনগণের ৬৬.১% পরিবার কৃষি কাজে জড়িত। এদের মধ্যে ৫৩% ক্ষুদ্র কৃষক, ১১% মধ্যম এবং ২% পরিবার বড় কৃষক। এদের মধ্যে অনেকেই চিংড়ি চাষীতে পরিণত হচ্ছে।

কৃষি শ্রমিক : চাষের জমির অভাব, কৃষি উপকরণ ও আর্থিক সামর্থ্যের অভাবের কারণে জেলায় অনেক লোকই তাদের জীবিকার জন্য কৃষি শ্রমের উপর নির্ভরশীল। বি.বি.এস. এর কৃষি শুমারী (১৯৯৬) অনুসারে দেখা যায় যে, জেলায় গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৪৬% পরিবার কৃষি শ্রমিক। এই হার দিনে দিনে বাড়ছে।

শহুরে শ্রমিক : সাতক্ষীরা জেলার শহরাঞ্চলে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে কাজের অভাব, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে লোকজন সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রাম থেকে শহরে এসে দিন-মজুরে পরিণত হচ্ছে।

জেলে : জেলার অনেক লোক মাছ ধরার উপর নির্ভর করে থাকে। জেলার মোট গ্রামীণ কৃষক পরিবারের মধ্যে ২২% পরিবার মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

সাতক্ষীরা জেলাতে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল বিশেষ ধরনের জীবিকাদল যেমন বাওয়ালী, মাওয়ালী, কাঠুরে দেখা যায়।

দারিদ্র্য

এই জেলায় পুষ্টি গ্রহণের ভিত্তিতে ৫৫% লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। এই হার উপকূল ও বাংলাদেশের হারের চেয়ে অনেক বেশি। তবে ১৪% লোক অতিদরিদ্র সীমার নীচে বাস করে, যা উপকূল ও বাংলাদেশের হারের চেয়ে অনেক কম । আবার গ্রামীণ জনগণের ৫৪% পরিবারই ভূমিহীন।

দরিদ্র	**৫৫%**
অতি দরিদ্র	**১৪%**
ভূমিহীন	**৫৪%**
ক্ষুদ্র কৃষক	**৫৩%**

নারীদের অবস্থান

উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নোয়াখালী জেলার নারীদের অবস্থান কিছুটা ভিন্ন। সিপিডি-ইউ.এন.এফ.পি.এ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়নসূচক তৈরি করেছে। এই হিসাব অনুযায়ী সাতক্ষীরা জেলা উচ্চমাত্রার লিঙ্গীয় অসমতাপূর্ণ জেলা। সাতক্ষীরা জেলার নারীদের অবস্থান বিশেষ কিছু সূচকের ভিত্তিতে আলোচনা করা হল।

লিঙ্গ অনুপাত : সাতক্ষীরা জেলার মোট জনসংখ্যার ৪৯% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৩, যা উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) জনসংখ্যায় লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৭ । কিন্তু প্রজননক্ষম বয়সদলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:৯৮।

নারীর অবস্থান

- সার্বিক ও প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতের হার উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের হারের চেয়ে অনেক কম।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুর ভর্তির হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে কম।
- সক্রিয় শ্রম শক্তিতে নারীদের অংশ গ্রহণ বেশি।
- লিঙ্গ অনুপাত (১০০:১০৩) নারীর প্রতিকূলে।
- মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে কম।
- ঘরে বা বাড়িতে সন্তান প্রসবের হার বাংলাদেশের হারের চেয়ে বেশি।
- কৃষিজীবী গ্রামীণ পরিবারে নারী প্রধান গৃহের সংখ্যা বেশি।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫ জন , যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) সমান ।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৫৫%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় বেশি।

প্রজনন স্বাস্থ্য : পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FPMIS-১৯৯৯)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার ৫.৪০, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। সাতক্ষীরা জেলার নারীরা তাদের জীবদ্দশায় গড়ে ২.৪২ টি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকেন। জেলার ৫৫% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১%।

বৈবাহিক অবস্থা : জেলার ১০ বছর ও তার উর্ধ্বে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩০% নারী বিবাহিত এবং ০.৩২% নারী স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস, ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৫৭% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শ্রমশক্তি : সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় উপকূলীয় অঞ্চলেও নারী পুরুষের কাজের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। নারীরা প্রধানত পরিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। পর্দাপ্রথা, প্রথাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদির প্রভাবে অকৃষিখাত বা চাকরি ও সেবামূলক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক কম হয়ে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত নারীরা নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। চিংড়ির চাষের সম্প্রসারণের ফলে আগে যে কৃষক মোটামুটিভাবে স্বচ্ছল ছিল সে এখন হয়েছে ভূমিহীন দিন মজুর। যে সব নারীরা আগে ঘর হতে বের হতেন না পেটের তাগিদে তাদের এখন হতে হচ্ছে ঘেরের শ্রমিক। তবে শিক্ষার ক্রমবিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী,

সরকারী ও বেসরকারী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলেও প্রথাগত ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। শ্রমশক্তি জরিপ (১৯৯৯-২০০০) অনুসারে ১৯৯৯-২০০০ সালে সাতক্ষীরা জেলার মোট শ্রমশক্তির ৪৫%ই ছিল নারী। এই হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী আরো দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে নারীদের অংশগ্রহণ (১৪%) গ্রামাঞ্চলের (৪৭%) তুলনায় কম। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ৩১% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

কিন্তু শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হারের তুলনায় নারীদের মজুরি প্রাপ্তি অনেক কম। কৃষি শুমারী (১৯৯৬) অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৮% নারী কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও কোনো প্রকার মজুরি পায় না।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি : স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগতমান নারীদের অবস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাবে নারীদের ৯৪%ই ঘরে সন্তান প্রসব করে থাকেন। এই হার বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে বেশি। আবার প্রসবকালীন সময়ে ১৩% ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই ও ১০% ক্ষেত্রে ডাক্তাররা সহায়তা করে থাকেন। ৭৬% ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিরা সহায়তা করে থাকেন।

এই জেলায় নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৭ জন, যা বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে বেশি। জেলার ২% শিশু চরম অপুষ্টির শিকার এবং মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (২%) ছেলে শিশুদের সমান।

শিক্ষা : শিক্ষা ক্ষেত্রে সাতক্ষীরা জেলার নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে। সার্বিক ও প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার হার (যথাক্রমে ৩৯% ও ৩৮%) উপকূল ও বাংলাদেশ হারের চেয়ে অনেক কম। নারী শিক্ষার হার পুরুষদের শিক্ষার হারের তুলনায় কম। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদের তুলনায় বেশি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলোয় মোট ছাত্রছাত্রীর অর্ধেকই মেয়ে। কলেজগুলোতে প্রায় ৩০% ছাত্রী। এই অবস্থান উপকূলীয় প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নারী নির্যাতন : ঘরের ভেতরে-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। ঘরে নারী নির্যাতন জেলার একটি অতিপরিচিত ঘটনা।

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট

এই জেলায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে মোট ২৬৬ কি. মি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে আঞ্চলিক মহাসড়ক ২৯ কি. মি. এবং উপজেলা সদরগুলোর মধ্যে সংযোগকারী সড়ক ২৩৭ কি. মি.। এ ছাড়াও এলজিইডি-র অধীনে ২,৩৮৮ কি. মি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে। সব মিলিয়ে এই জেলায় রাস্তার ঘনত্ব ০.৬৯ কি. মি./ বর্গ কি. মি., যা উপকূলীয় অঞ্চল ঘনত্বের চেয়ে কম।

পাকা রাস্তা	২,৬৫৪ কি.মি.
সওজ রাস্তা	২৬৬ কি.মি.
এলজিইডি রাস্তা	২,৩৮৮ কি.মি
রাস্তার ঘনত্ব	০.৬৯ কি.মি./ বর্গ কি.মি.

পোল্ডার

অধিক ফসল উৎপাদন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে গণমানুষকে রক্ষার তাগিদে ষাটের দশকে সাতক্ষীরা জেলায় পোল্ডার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৬৪৯ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে, যা প্রায় এক লক্ষ ৬৮ হাজার হেক্টর জমিকে লোনা পানির হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। ৬৬০টি রেগুলেটর ও ৬৪৩ কি.মি. পানি নিষ্কাশন চ্যানেলের মাধ্যমে পোল্ডারগুলো থেকে পানি নিষ্কাশন করা হয় (সিইআরপি, ২০০০)।

বাঁধ	৬৪৯ কিঃমিঃ
রেগুলেটর	৬৬০ টি
নিষ্কাশন খাল	৬৪৩ কিঃমিঃ

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

এই জেলায় মোট ৪৮টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোয় জেলার ৫% লোক আশ্রয় নিতে পারে। বছরের অন্যান্য সময় এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

১৯৯৮ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, এই জেলায় মোট ২৬০টি ক্লাব, ৪২টি কমিউনিটি সেন্টার, ২১৮২টি সমবায় সমিতি ও ১৪টি পেশাজীবী সংগঠন রয়েছে। এছাড়া ১,৫৬৮ টি মসজিদ, ৯৩টি মন্দির ও ১৭টি চার্চ রয়েছে।

এ ছাড়া ১৫টি সিনেমা হল, ১৬টি লাইব্রেরি, ৯৩টি খেলার মাঠ, ১৭টি লিটারারি সোসাইটি, ২০টি থিয়েটার গ্রুপ, ১টি থিয়েটার মঞ্চ, ৩২ টি যাত্রা দল, ৯১টি নারীদের সংগঠন, ১টি শিল্পকলা একাডেমি ও ১টি কম্যুনিটি সেন্টার রয়েছে।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো

ব্যাংক ও ঋণ সুবিধা : সাতক্ষীরা জেলায় প্রধান সবগুলো ব্যাংকেরই শাখা রয়েছে। এক হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৯৯-২০০০ সালে জেলার ব্যাংকগুলোয় প্রায় তিন হাজার মিলিয়ন টাকা জমা ছিলো। এই সঞ্চয় ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ৫৪% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রবণতার সাথে সংগতিপূর্ণ। অপর আরেক হিসাবে দেখা যায় যে, প্রধান চারটি ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী এনজিও (ব্র্যাক, আশা, কারিতাস ও প্রশিকা) জেলার প্রায় ১৭% পরিবারকে ঋণ দিয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক স্থানীয় এনজিও ঋণ দিয়ে থাকে। এদের মোট সংখ্যা ১৩টি, সদস্যসংখ্যা ৬৫,৯১৪ (যার মধ্যে ৮৭% নারী) এবং ২০০১ সাল পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬০ কোটি টাকা।

হাট-বাজার ও বন্দর : ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সাতক্ষীরা জেলায় মোট ৩৮টি হাট-বাজার আছে। প্রতিটি বাজার গড়ে ১০২ বর্গ কিলোমিটারের লোকদের সুবিধা দিয়ে থাকে। কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলে গড়ে প্রতি ৮০ বর্গ কিলোমিটারে একটি কেন্দ্র রয়েছে, যা জেলার হাট-বাজারের অপ্রতুল অবস্থার কথা তুলে ধরে ।

এই জেলায় ভোমরা নামক স্থানে একটি স্থল বন্দর রয়েছে। এই বন্দর থেকে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সাথে পণ্যাদি আমদানি রপ্তানি হয়ে থাকে। তবে এই বন্দর বর্তমানে নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত।

বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ : জেলার মোট ১৮% বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। তবে শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহরের মোট ৫৩% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অথচ গ্রামে এর পরিমাণ মাত্র ১৫%। এই হার নগরায়ণের বিস্তারকে চিহ্নিত করে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে জেলার মাত্র ৬% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল। এই জেলায় মোট ১,৬৯১ টি টেলিফোন সংযোগ রয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো

এই জেলায় প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের মধ্যে টেক্সটাইল মিল, ধান কল, বরফ কল, ময়দার কল, তেল মিল, বিস্কুট ফ্যাক্টরি, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, কোল্ড স্টোরেজ, কাঠের কল, লেদ মেশিন ও ঝালাইর কারখানা ও প্রেস অন্যতম। এই জেলায় একটি বিসিক শিল্প নগরী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

সাতক্ষীরা জেলা কুটির শিল্পের জন্যও বিখ্যাত। এই জেলা বাঁশ ও বেতের কাজ, মৃৎশিল্প, কাঠের কাজ ও পাটি বোনার জন্য বিখ্যাত। এ ছাড়াও এই জেলায় কুটির শিল্পের মধ্যে স্বর্ণকার, কামার, দর্জি, খেজুরের গুড় তৈরি, পাটের কাজ অন্যতম।

কৃষি অবকাঠামো

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অনেকাংশেই কৃষি অবকাঠামোর উপর নির্ভরশীল। সাতক্ষীরা জেলার মোট আবাদকৃত জমির ৩৪% জমিতে সেচ দেয়া হয়। এই হার উপকূল গড়ের চেয়ে (৩০%) বেশি, তবে বাংলাদেশ গড়ের (৫০%) চেয়ে অনেক কম। কিন্তু মাত্র ২% জমিতে ভূ-পৃষ্ঠের পানি থেকে সেচ দেয়া হয়। জেলায় মোট ১৭,৫০৬টি অগভীর নলকূপ, ৬৭৯টি শক্তিচালিত পাম্প এবং ১,০৫৪টি এলএলপি আছে। কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে ৫৭% গ্রামীণ পরিবার জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকে, ০.৫১% পরিবার ট্রাক্টর ও ১% পরিবার পাওয়ার টিলার ব্যবহার করে থাকে। বিবিএস (১৯৯৮) এর তথ্য অনুসারে, এই জেলায় মোট ৪৪টি গুদাম রয়েছে। যাদের মোট ধারণক্ষমতা হল ১৮,৪৭৬ মে. টন।

সেচ এলাকা (মোট)	৫৪,৯৯১ হেক্টর
সেচ এলাকা (%)	৩৪%
ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার	৩২%
উপরিভাগের পানি ব্যবহার	২%

গুদামের ধরণ	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (মে.টন)
খাদ্য	২৮	১৩,৭৪০
বীজ	১২	৭৩৬
সার	৪	৪০০০

এখানে ৮৬ টি ডেইরি ফার্ম, ৩২২ টি পোলট্রি, ৩,০৪৬ টি মাছের খামার, ৬৬ টি হ্যাচারী, প্রায় ১০,০০০টি চিংড়ি ঘের ও ১ টি কৃত্রিম গো- প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে।

সাতক্ষীরা অঞ্চলে গলদা চিংড়ির ঘেরের সংখ্যা ১৫১টি এবং এর আয়তন ৩৩৮.১৭ হেক্টর। বার্ষিক উৎপাদন ৯০৩ মেট্রিক টন। প্রদর্শনী খামারের সংখ্যা ১৯টি। দেবহাটা উপজেলার গাজীরহাটে ১৯৯২ সালে সরকারিভাবে ১০.৫ হেক্টর জায়গায় চিড়িং পোনা উৎপাদন কেন্দ্র (হ্যাচারী) স্থাপিত হয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে সাতক্ষীরা জেলায় ৮টি ফিস প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সবগুলোই বন্ধ আছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষা (পিডিও-আইসিজেডএমপি ২০০৪) থেকে দেখা যায়, সাতক্ষীরা জেলায় ১৫টি সরকারী প্রকল্প চালু রয়েছে। যেসব সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি।

সরকারী সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	২
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩
বন বিভাগ	২
মৎস্য অধিদপ্তর	১
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	২
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হল দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প, বৃহত্তর খুলনা জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্বাসন প্রকল্প, বৃহত্তর যশোর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সামুদ্রিক চিংড়ি চাষ পদ্ধতি সম্প্রসারণ প্রকল্প, চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, বৃহত্তর খুলনা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প, সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প, ১৫ পিবিএস বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রকল্প, পিবিএস সাব স্টেশনগুলোর মধ্যে ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ সংযোগ লাইন স্থাপন প্রকল্প ইত্যাদি। জেলার উন্নয়নে এনজিওদের অবদানও অনস্বীকার্য। এই জেলায় কর্মরত প্রধান এনজিওগুলোর মধ্যে সুশীলন, উত্তরণ, চেতনা, ভূমিষ্ঠ, নকশি কাঁথা, আইডিয়াল, রিশিল্পী, উষা, পারাপার, যুব একাডেমি সাতক্ষীরা, সিডস, ওয়ার্ল্ড ভিশন, ব্র্যাক, কেয়ার অন্যতম।

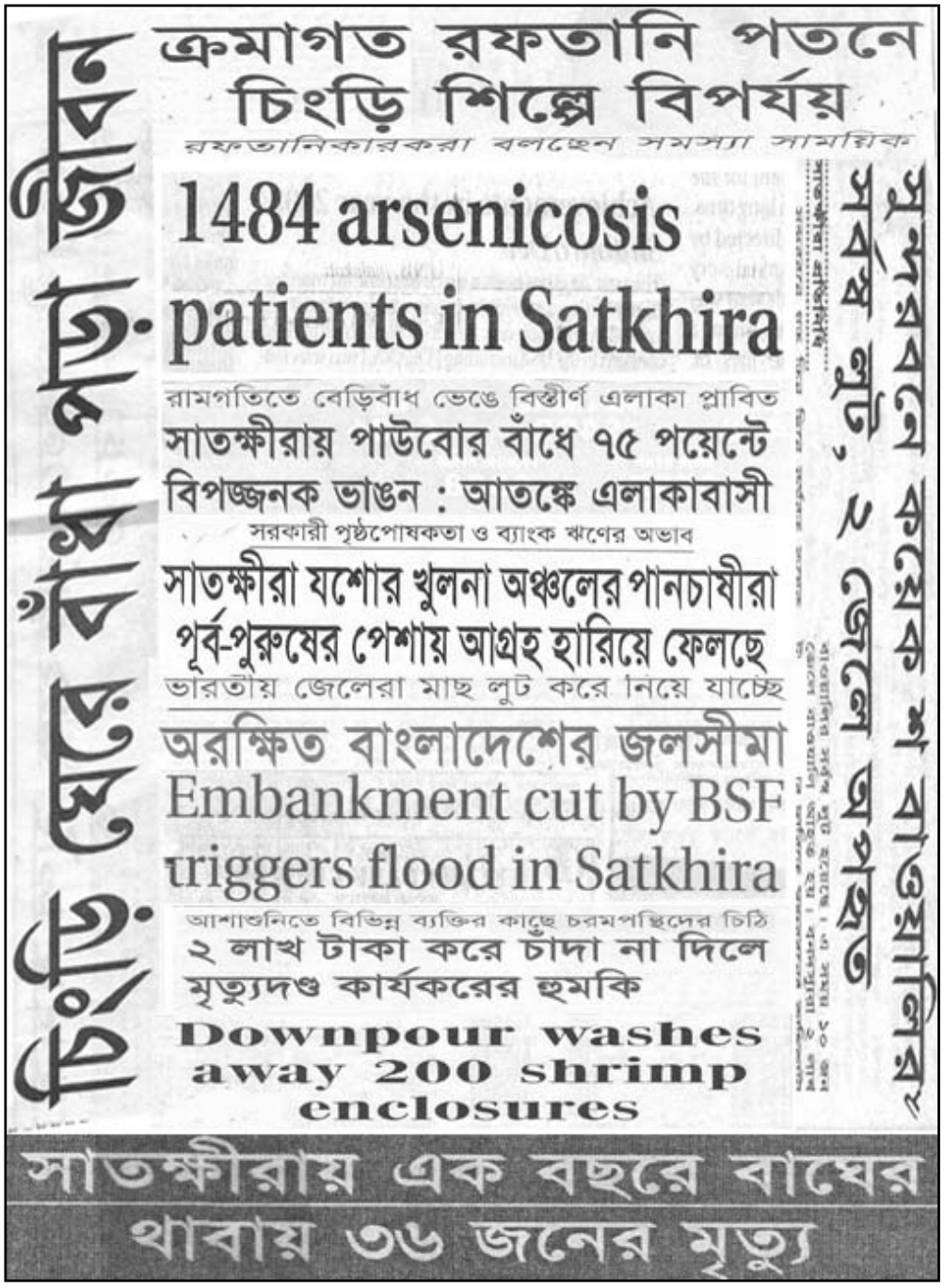

ক্রমাগত রফতানি পতনে
চিংড়ি শিল্পে বিপর্যয়
রফতানিকারকরা বলছেন সমস্যা সাময়িক

1484 arsenicosis patients in Satkhira

রামগতিতে বেড়িবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত
সাতক্ষীরায় পাউবোর বাঁধে ৭৫ পয়েন্টে
বিপজ্জনক ভাঙন : আতঙ্কে এলাকাবাসী
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যাংক ঋণের অভাব

সাতক্ষীরা যশোর খুলনা অঞ্চলের পানচাষীরা
পূর্ব-পুরুষের পেশায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে

ভারতীয় জেলেরা মাছ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে
অরক্ষিত বাংলাদেশের জলসীমা

Embankment cut by BSF triggers flood in Satkhira

আশাশুনিতে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে চরমপন্থিদের চিঠি
২ লাখ টাকা করে চাঁদা না দিলে
মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের হুমকি

Downpour washes away 200 shrimp enclosures

সুন্দরবনে কয়েক শ বাওয়ালির
সর্বস্ব লুট, ২ জেলে অপহৃত

সাতক্ষীরায় এক বছরে বাঘের
থাবায় ৩৬ জনের মৃত্যু

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

সাতক্ষীরা জেলার মানুষ একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অপরদিকে পারিপার্শ্বিকতার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার দ্বারাও আক্রান্ত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এই জেলার মানুষ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদী ভাঙ্গনের সাথে লড়াই করে আসছে। নীচে বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় চিহ্নিত প্রধান কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার কথা আলোচনা করা হল।

পরিবেশগত সমস্যা

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস : স্মরণকাল থেকেই সাতক্ষীরা জেলা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হয়ে আসছে। মাত্রাগত দিক দিয়ে এ জেলা মাঝারী ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত এবং জেলার শ্যাম নগর ও আশাশুনি উপজেলার লোকজন বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন। জেলায় অবস্থিত সাইক্লোন শেল্টারগুলো মোট জনসংখ্যার ৫% লোককে ঘূর্ণিঝড়ের সময় আশ্রয় দিতে পারে, যা মোটেও যথেষ্ট নয়।

পরিবেশগত সমস্যা
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস
- আর্সেনিক
- মাটি ও পানির লবণাক্ততা
- জলাবদ্ধতা
- বন্যা
- খরা
- নদী ভাঙন
- বন উজাড়
- মাছের প্রজাতি হ্রাস
- পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া

চিংড়ি চাষের সমস্যা
- চিংড়ি উৎপাদনের সমস্যা
- চিংড়ি চাষের পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- সুপেয় বা মিঠা পানির অভাব
- বাঘের আক্রমণ

আর্সেনিক : আর্সেনিক আক্রান্ত জেলাগুলোর মধ্যে সাতক্ষীরা অন্যতম। জেলার নলকূপগুলোয় আর্সেনিকের গড় মাত্রা ১৩৩ মাইক্রোগ্রাম/লিটার। সমীক্ষাটিতে আরো দেখা গেছে যে নলকূপগুলোর মধ্যে ৬৭ শতাংশেই আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের চেয়ে বেশি, যা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। এত বেশিমাত্রার আর্সেনিক শুধু ত্বকের রোগই সৃষ্টি করে তাই নয়, বেশি দিনের সংক্রমণে এটি ক্যান্সার ও ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : সাতক্ষীরা জেলার মাটি ও পানির লবণাক্ততার মাত্রা যথাক্রমে সর্বোচ্চ ১৫ ও ১০ পিপিএম। পানির লবণাক্ততা একদিকে যেমন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমিয়ে দেয় অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের রোগেরও কারণও হয়ে থাকে। অপরদিকে মাটিতে লবণাক্ততার জন্য সব ধরনের ফসলও হয় না এবং মিঠা পানির অভাবে সব সময় সেচও দেয়া যায় না। এই জেলায় মাটি ও পানির লবণাক্ততার মাত্রা বিভিন্ন কারণে ধীরে ধীরে বাড়ছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চিংড়ির ঘের তৈরি, নদীর মিঠা পানির প্রবাহ হ্রাস, নদী ভরাট, বর্ষাকালে ভূ-গর্ভের লবণাক্ত পানি উঠিয়ে চিংড়ি চাষ, খাল ও জলপ্রবাহ বন্ধ করে চিংড়ি ও মাছ চাষ ইত্যাদি।

জলাবদ্ধতা : জেলায় জলাবদ্ধতা একটি প্রধান সমস্যা। জেলায় মাঝারি নীচু জমির পরিমাণ বেশি এবং বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই এ জমিগুলো প্লাবিত হয় এবং পানি সরে যাওয়ার কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় ৫/৬ মাস পর্যন্ত এভাবেই থেকে যায়। ফলে রোপা আমন ধানের সুযোগ থাকলেও তা করা যায় না।

তবে শুধু যে ভূ-প্রাকৃতিক কারণেই সাতক্ষীরায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় তা নয়। ষাটের দশক থেকে লবণাক্ত পানির প্রবেশ

ঠেকানো ও ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পোল্ডার বানানো শুরু হয়। কিন্তু অপর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নদীর গতিপথ ও পানিপ্রবাহের দিক পরিবর্তন, অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, নদীতে পলি পড়ার হার পরিবর্তন, পোল্ডারের ভিতরের জলা পথগুলো ভরাট হয়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে এখন সাতক্ষীরার অনেক এলাকাই জলাবদ্ধ হচ্ছে।

বন্যা : সাতক্ষীরায় বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সবগুলো উপজেলাই কম বেশি বন্যাতে আক্রান্ত হয়। ২০০২, ২০০৩ ও ২০০৪ সালের বন্যায় এ জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

খরা : লবণাক্ততার পাশাপাশি খরার কারণেও জেলার ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলে এবং মাটি ও পানির ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততার কারণে খরার প্রভাব অনেক মারাত্মক হয়।

নদী ভাঙন : সুন্দরবন সংলগ্ন এবং সীমান্ত বর্তী নদীগুলোতে ভাঙন জনমানুষের জীবনে একটি বড় সমস্যা। নদী ভাঙনের ফলে একদিকে যেমন সম্পদ বিনষ্ট হয় তেমনি মানুষের জীবন জীবিকাও হুমকির মুখে পরে।

বন উজাড় : বন ধ্বংস ঠেকানোর জন্য সরকারের সর্বাত্মক পদক্ষেপ সত্বেও আশংকাজনক হারে প্রাকৃতিক বন উজার হয়ে যাচ্ছে। তদুপরি এই জেলায় ব্যাপক সামাজিক বনায়ন হলেও সুষ্ঠ তদারকির অভাবে দেখা যায় অধিকাংশ চারাই বড় হয়ে ওঠার আগেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : অতিরিক্ত মাছ ধরার কারণে তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর অগভীর পানির মাছ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। আগে যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যেত এখন আর সেই পরিমাণ পাওয়া যায় না।

পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া : পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার ফলে সাতক্ষীরা জেলা পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখে পরেছে। এই অঞ্চলে বৃক্ষনিধন হচ্ছে অবাধে। ফারাক্কার প্রভাবে বেশিরভাগ নদীই শুকিয়ে গেছে অথবা মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। অনাবৃষ্টির পরিমাণও বেড়েছে, বেড়েছে চিংড়ির ঘেরের জন্য সেচের মাত্রা। আর মূলত এ কারণগুলোই পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে নেমে যাওয়ার পিছনে কাজ করছে। পানির স্তরের নিম্নমুখী গতি ঠেকানো না গেলে ভয়াবহ বিপর্যয় অবশম্ভাবী হয়ে পড়বে।

চিংড়ি চাষের সমস্যা

চিংড়ি উৎপাদনের সমস্যা : সাতক্ষীরা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চিংড়ির চাষ হয়। কিন্তু চিংড়ি উৎপাদনের হার অনেক কম। যেখানে অন্যান্য দেশে এই হার প্রতি হেক্টরে ৫০০ কিলোগ্রাম সেখানে বাংলাদেশে মাত্র ১৩০-১৩৫ কিলোগ্রাম। মাছের পোনার মৃত্যু হারও ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। অর্থাৎ যদি ১০০টি মাছের পোনা পুকুরে ছাড়া হয় তবে মাত্র ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেঁচে থাকে। চিংড়ির স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। এ দেশের রপ্তানিকৃত চিংড়িতে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ নাইট্রোফিউরেন পাবার অভিযোগ রয়েছে।

চিংড়ি ঘেরগুলোয় ভাইরাস আক্রমণের ফলে হাজার হাজার চিংড়ি চাষী নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। চিংড়ির মড়ক, চাষাবাদে নানা প্রতিকূলতা ও বাজারজাতকরণের সমস্যায় পড়ে চাষীরা চিংড়ি চাষের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চিংড়ি খামারে হোয়াইট স্পট ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় চিংড়ি চাষ এখন হুমকির সম্মুখীন।

আবার উৎপাদন থেকে শুরু করে রপ্তানি পর্যন্ত মাছ চাষীরাই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছে। তারা চিংড়ির খুব কম মূল্য পেয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে চিংড়ির মূল্য বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না বরং নিয়ন্ত্রিত হয় প্রক্রিয়াজাতকরণ

ব্যবসায়ী দ্বারা। চিংড়ি ভোক্তার হাত পর্যন্ত পৌছাতে মোটামুটিভাবে ৪টি ধাপ পার হয়ে যেতে হয় যেমন কমিশন এজেন্ট, সাব এজেন্ট, ফড়িয়াসহ প্রতি স্তরেই ৭ থেকে ১০ শতাংশ লাভের হার যুক্ত হয়, যা মূলত মধ্যস্বত্বভোগীদের ঘরেই যায়।

চিংড়ি চাষের পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা : চিংড়ি রপ্তানি যদিও দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী রপ্তানীখাত কিন্তু চিংড়ি চাষের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব ব্যাপক। এর প্রধান কিছু প্রভাব নীচে আলোচনা করা হল।

- চিংড়ি ঘের তৈরি বা চিংড়ি চাষ একটি পুঁজি নির্ভর ব্যবসা। এখানে গরীব লোকের পক্ষে চিংড়ি ঘেরের মালিক হওয়া সম্ভব নয়। আবার এই ব্যবসায় লাভের হারও অনেক। ফলে গরীব লোকেরা চাক বা না চাক তাদের জমি লিজ বা বিক্রি ইত্যাদির মাধ্যমে ঘের ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় তারা নগদ অর্থের জন্য জমি বিক্রি করে দেয়। আশপাশের জমিতে ঘের থাকলে তাদের কৃষি জমি ধীরে ধীরে লবণাক্ত হয়ে যায় এবং উর্বরতা হ্রাস পায়। আবার কৃষকরা ঘের মালিকদের বাধার কারণে তাদের জমিতে কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে পারে না। ফলে কৃষি জমি থেকে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভবপর হয় না।
- ঘেরগুলো ক্রমাগত লবণ পানি ধরে রাখার ফলে জমি ধীরে ধীরে লবণাক্ত হয়ে অনুৎপাদনশীল হয়ে যাচ্ছে। ফলে বছরের অন্যান্য সময় ঘেরের জমিতে কোনো ফসল করা যায় না। আবার আশপাশের কৃষি জমিও ধীরে ধীরে লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ঝোঁপঝাড়, ঘাস, গাছ, লতা-পাতা মরে যাচ্ছে।
- লবণাক্ততার ফলে গবাদিপশুর চারণভূমি কমে যাচ্ছে। অধিকাংশ পরিবারই বাধ্য হয়েছে তাদের গবাদি পশু বিক্রি করে দিতে। ফলে দুধ, ডিম ও হাঁস-মুরগি মাংসের স্থানীয় পর্যায়ে সরবরাহ অনেক হ্রাস পেয়েছে।
- ঘাস, লতা-পাতা, গাছ মরে যাওয়ার কারণে জ্বালানিরও তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। গরীব জনগোষ্ঠীকে এখন জ্বালানি বাজার থেকে কিনে নিতে হচ্ছে। অনেকে আবার অবৈধভাবে সুন্দরবন থেকে জ্বালানি ও কাঠ সংগ্রহ করছে। ফলে বন ধ্বংসের হারও বেড়ে গেছে।
- চিংড়ি ঘেরের ফলে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। আগে যে কৃষক মোটামুটিভাবে স্বচ্ছল ছিল সে এখন হয়েছে ভূমিহীন দিন মজুর। যে সব নারীরা আগে ঘর হতে বের হতেন না পেটের তাগিদে তাদের এখন হতে হচ্ছে ঘেরের শ্রমিক। তাদের নিরাপত্তহীনতা বেড়েছে বহু গুন এবং তারা প্রায়শই নির্যাতন, অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন ঘেরের মালিক এবং তাদের পুরুষ সহকর্মী দ্বারা। শিশুরা হচ্ছে পুষ্টিহীনতার শিকার।
- অনেক শিশু ও নারীরা এখন চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে থাকে। এ কাজে তাদের ঘন্টার পর ঘন্টা পানিতে কাটাতে হয়। ফলে তারা বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আবার আর্থিকভাবে লাভজনক হবার কারণে অনেক শিশুই স্কুলে না যেয়ে এই কাজে লিপ্ত থাকে। হাতে কাঁচা টাকা আসার কারণে শিশুরা হয়ে পড়ছে অবাধ্য। তাদের অপরাধচক্রের সাথে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনাও বহুগুনে বেড়ে গিয়েছে।
- ঘেরের মাছ রক্ষার জন্য ঘেরের মালিকরা সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন সর্বহারা বাহিনীকে তাদের প্রচুর অর্থ দিতে হয়।

- নিরাপদ পানীয় জলের অভাব নারীদের জীবনকে আরো দুর্বিসহ করেছে। চিংড়ির ঘেরের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর লবণাক্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।
- চিংড়ির পোনা ধরার সময় অন্যান্য মাছের পোনাও মারা যায়। ফলে জেলার নদী-নালাগুলোয় মৎস্য সম্পদ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। ব্যাপক দারিদ্র্য ও বেকারত্বের ফলে অনেক লোকই অবৈধভাবে সুন্দরবন থেকে গাছ ও গোলপাতা কাটছে। লবণাক্ততার ফলে গাছ, ঘাস, লতা-পাতা মরে যাওয়ার ফলেও এলাকার পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।
- চিংড়ি ঘেরের ফলে এলাকার প্রতিবেশ বদলে যাচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : জেলার আন্তর্জাতিক সীমানা বিভাজনকারী ইছামতি ও কালিন্দী নদীর জলসীমা দিয়ে ফেনসিডিল, মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্য বিপুল পরিমাণ চোরা-চালান হয়। শ্যামনগর উপজেলার সুন্দরবন ঘেষা কৈখালী থেকে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার হাড়হদ্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৭০ কিলোমিটার নদী সীমান্ত চোরাচালানের নিরাপদ রুট।

সাতক্ষীরা জেলা মানুষ পাচারের একটি নিরাপদ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই জেলার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা, যেমন ভোমরা, শ্যামনগর, কালিগঞ্জ থেকে প্রতিনিয়তই মানুষ পাচার হচ্ছে। এসব এলাকায় মানুষ পাচারের একটি শক্তিশালী চক্র রয়েছে। এই চক্রটি আবার আন্তর্জাতিক চক্রের সাথে যুক্ত। লোকজনকে বিভিন্ন প্রলোভন যেমন কাজের সুযোগ, বিবাহ, বিদেশী নাগরিকত্ব ইত্যাদি দেখিয়ে নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে পাচার করে থাকে। নারী ও মেয়ে শিশুদের সর্বশেষ গন্তব্য হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারতের কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাইসহ বিভিন্ন বড় বড় শহরের পতিতালয়, ড্যান্স ক্লাব, ম্যাসাজ পার্লার, নাইট ক্লাব ইত্যাদিতে। পুরুষদের অনেককেই কাজ করতে হয় কৃষি ক্ষেতে, মাছ ধরার ট্রলারে, শ্রমিক, দাস এবং বিভিন্ন অপরাধী চক্রের সাথে, ছেলে শিশুদের অনেকেই উটের জকি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য পাচার হয়ে যায় দুবাইতে। আর যারা হতভাগ্য তাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাসপাতাল ও ক্লিনিকে বিক্রি হয়ে যায়। তবে মানুষ পাচারের উপর কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশীপ সেন্টার পরিচালিত এক সমীক্ষাতে বলা হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১০ লাখ নারী, পুরুষ ও শিশু পাচার হয়েছে এবং এখন গড়ে বছরে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ পাচার হচ্ছে। তবে এর বিপরীতে পুলিশ ও বিডিআর - এর ভূমিকা খুবই সীমিত।

সুপেয় বা মিঠা পানির অভাব : জেলার নদীগুলোতে মিঠা পানির প্রবাহ হ্রাস, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের নিম্নগমন, ক্রমবর্ধমান মাটি ও পানির লবণাক্ততা এবং সর্বোপরি আর্সেনিকের মারাত্মক প্রকোপের ফলে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান মিঠা পানির সংকট জেলাবাসীর জীবনকে মারাত্মকভাবে বিপদগ্রস্ত করছে।

বাঘের আক্রমণ : সাতক্ষীরা জেলার বিপুল পরিমাণ এলাকা জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত। এই বন একদিকে যেমন মানুষের জীবন ও জীবিকার উৎস তেমনি বিপদেরও কারণ হয়ে থাকে। প্রায়শই বন থেকে বাঘের লোকালয়ে প্রবেশের খবর পাওয়া যায়। অনেক সময় মানুষজন হতাহত হয়। আবার অনেক সময় লোকজন বাঘ তাড়িয়ে দিতে বা মেরে ফেলতে সক্ষম হয়। বন সংলগ্ন এলাকার দরিদ্র অধিবাসীরা বাঘের মুখোমুখি হয় বেশি। পেটের তাড়নায় তারা মাছ ধরা, গোলপাতা সংগ্রহ বা মধু সংগ্রহের জন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। এ সময় না থাকে তাদের জীবনরক্ষাকারী

বন্দুক বা অন্য কোনো উপকরণ না থাকে পূর্বসতর্কীকরণ ব্যবস্থা। ফলে জঙ্গলে অবস্থানকালে তারা যেকোনো সময় বাঘের আক্রমণের শিকার হতে পারে। আবার শিকারের অভাব, শিকার ধরতে অক্ষমতা, আবাসস্থল নষ্ট হওয়া, আঘাত বা অন্য কোনো কারণে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে বাঘ লোকালয়ে প্রবেশ করে। তবে এরকম সময়ে বাঘ হত্যা না করে জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয়াই বাঞ্ছনীয়।

Industrial town will be set up in Satkhira

Noman tells reception to new dist BNP body

চিংড়ি খাতে বিপর্যয় এড়াতে ঢে
সাজাতে হবে হ্যাচারি শিল্প

প্রথম শুমারির ফল প্রকাশ

সুন্দরবনে পূর্ণবয়স্ক
বাঘের সংখ্যা ৪১৯

হিমায়িত চিংড়ি
রফতানি: সম্ভাবনার
নতুন দুয়ার

এশিয়ান হাতির ফসিল সাতক্ষীরায়!

Anwara's silent revolution

She has employed 40 at her garments factory, trained and rehabilitated 450 distressed women

New mangrove forest a safe haven for wild birds

চিংড়ি ঘেরের আইলে সবজি চাষ

বছরে ১০ হাজার কোটি টাকার চিংড়ি রফতানির সম্ভাবনা

সম্ভাবনা ও সুযোগ

সাতক্ষীরা জেলার জনসাধারণের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সম্পদ ও সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করে জেলার প্রভূত উন্নয়ন সাধন সম্ভব। বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় চিহ্নিত কয়েকটি প্রধান সম্ভাবনার কথা নিচে আলোচনা করা হল।

কৃষি সম্পদ উন্নয়ন

কৃষি সম্পদ উন্নয়ন
- কৃষি উন্নয়ন
- মাছ চাষ
- চিংড়ি চাষ
- নার্সারী শিল্প
- হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন
- সামাজিক বনায়ন

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ
- সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ
- বনজ সম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ
- জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

শিল্প উন্নয়ন
- পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন
- শিল্পাঞ্চল
- ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার

আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- অবকাঠামো সংরক্ষণ
- নিরাপদ পানি সরবরাহ

কৃষি উন্নয়ন : কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে পাকিস্তান আমলে অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে এ জেলার বিনেরপোতা নামক স্থানে সরকারিভাবে কৃষি গবেষণা খামার স্থাপিত হয়। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সমগ্র সাতক্ষীরার কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে।

২০০৪/০৫ সালে সাতক্ষীরা জেলায় বোরো চাষের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। মোট ৩৮,৪০০ হেক্টর জমিতে চাষ করে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১,২৮,৩৪০ মেট্রিক টন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বেশ কিছু প্রর্দশনী খামার স্থাপন করেছে। এ ছাড়া কৃষকদের মধ্যে উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক এবং অন্যান্য উপকরণ ন্যায্য দামে পৌছানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বেশ কিছু শ্যালো টিউবওয়েলও স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণ সরবরাহ করেছে।

কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার কৃষি গবেষণা ও উন্নত বীজ উৎপাদনের জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপের আওতায় গত দু'বছরে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ফসলের যেমন ধান, গম, পাট, আখ ও আলুর ১৫টি নতুন জাত চাষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় চাষ করার জন্য ব্রি ধান ৪০ ও ব্রি ধান ৪১ নামে দুটি জাত উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া হাইব্রিড ধান-১ অবমুক্ত করা হয়েছে। এ জাতের ধান বোরো মৌসুমে চাষ করে হেক্টর প্রতি ৭ থেকে ৮ টন ধান উৎপাদন সম্ভব হবে।

জলাবদ্ধতা কৃষির উন্নয়নে একটি প্রধান বাধা। বৃষ্টির পানি যাতে জমিতে জমে না থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করা হলে উচ্চ ফলনশীল জাতের আউশ, রোপা আমন এবং রবি শস্যের প্রচুর পরিমাণ আবাদ করা যেতে পারে। এ ছাড়া সুষম সার প্রয়োগ, জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার এবং উন্নত পরিচর্যার মাধ্যমে বর্তমানে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মাছ চাষ : সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ৮২% পুকুরে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে এবং হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন বছরে ২ মেট্রিক টন। আবার পরিত্যক্ত ও চাষযোগ্য পুকুরের পরিমাণ ১৮%, যেখানে মাছের গড় উৎপাদন বছরে ০.৮৮ মে.ট./হে.। এর হার উপকূলীয় ও বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে কম। কিন্তু যদি জেলার সমস্ত পুকুরগুলোকে উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতির আওতায় আনা হয় তবে উৎপাদন অনেক বাড়তে পারে।

চিংড়ি চাষ : উপকূলীয় অঞ্চলে আধা লোনা বা স্বল্প লোনা পানিতে বাগদা চিংড়ি চাষ করা হয়। নিম্নাঞ্চলের খাড়ি এলাকা, বারোপিট ও কৃষি জমিতে বেড়িবাঁধ দিয়ে ঘের তৈরি করা হয়। পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের সুযোগ দেখেই

ঘের স্থাপন করা হয়। আমাদের দেশের বর্তমান চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি ঘেরে একক চিংড়ি চাষ করা হয়। তার সাথে অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ি ও মাছ চাষ করা হয়। দেখা যায়, বাগদা চিংড়ি ৮০-৮৫% অন্যান্য চিংড়ি ১০-১৫% এবং মাছ ৫-১০%। উন্নত চিংড়ি চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনে প্রয়োজন চিংড়ি চাষের এলাকা নির্দিষ্ট করা ও অবকাঠামো উন্নয়ন। এলাকাভিত্তিক সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও পরিবেশ সহনীয় চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা করা হলে পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার অশংকা কমবে এবং চাষীদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষক তথা দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে এই জেলায়। সহায়ক পরামর্শ ও কিছু পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এক হেক্টর জমিতে তিন মাসে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে প্রায় ৪ লাখ টাকা আয় সম্ভব।

যদি বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ করা যায় তবে প্রতি ইউনিট জমিতে উৎপাদন ২-৩ গুন বাড়ানো সম্ভব, তবে এর জন্য প্রয়োজন পুকুর প্রস্তুতি, সচেতনতা সৃষ্টি, চাষীদেরকে চিংড়ি উৎপাদন সম্পর্কে জ্ঞানদান, পুকুর প্রশস্ত ও গভীর করা, পাড় উঁচু করা যাতে দূষিত পানি চার পাশ থেকে পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে। পুকুরের চার পাশে জালের বেড়া দেয়া, পানি জমানোর ব্যবস্থা করা যাতে প্রয়োজনের সময় পরিষ্কার পানি সরবরাহ করা যায় ইত্যাদি।

নার্সারী শিল্প : জেলায় ব্যক্তিখাতে নার্সারীর ব্যবসা বেশ সাড়া জাগিয়েছে। এই লাভজনক ব্যবসার সাথে বর্তমানে অনেক উৎসাহী লোক জড়িয়ে পড়ছে। জেলায় এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রায় দুই হাজার দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক জড়িত রয়েছে। নার্সারীগুলোয় বিভিন্ন জাতের গাছ যেমন আম, কাঁঠাল, সেগুন, মেহগনি, শাল, লেবু, বাতাবী লেবু, লিচু, জাম ও বিভিন্ন ঔষধি গাছের চারা উৎপাদন করা হয়। নার্সারী মালিকদের যদি প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়া হয় তবে এই শিল্পের আরো প্রসার হবে।

সাতক্ষীরা জেলায় ব্যাপকভাবে ফুল চাষ হয়। জেলার বিভিন্ন স্থানে সূর্যমুখী, রজনীগন্ধা, কাঞ্চন, গোলাপ ইত্যাদি ফুলের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করা হয়। এই ফুল বিদেশেও রপ্তানি হয়। তবে এতদিন পর্যন্ত যা হয়েছে সবই ব্যক্তি উদ্যোগে যা কোন সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই চলছিলো, কিন্তু বিদেশে ফুলের চাহিদা ধরে রাখতে প্রয়োজন উন্নত কারিগরী প্রযুক্তির প্রয়োগ। আধুনিক গ্রীন হাউস পদ্ধতিতে ফুল চাষে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ফুলের গুনগত মান উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে।

হাস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন : পোল্ট্রি ফার্মিং জেলায় বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। ছাত্র, বেকার শিক্ষিত যুবক ও পেশাজীবীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আশায় পোল্ট্রি ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়ছে। দেশের প্রধান শহরগুলোর সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ডিম ও মুরগী সহজেই বিভিন্ন স্থানে পাঠানো যাচ্ছে। আবার দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকাররা আসে। তবে এখন পর্যন্ত পোল্ট্রি শিল্পে সরকারি পর্যায়ে তেমন কোনো সহায়তা দেয়া হয়নি। যদি পর্যাপ্ত ঋণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দেয়া হয় তবে এই শিল্পের আরো প্রসার হবে।

সামাজিক বনায়ন : সামাজিক বনায়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এই জেলায়। সরকার ইতোমধ্যেই বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এ ছাড়া লোকজন তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন ফল ও কাঠের গাছ যেমন আম, কাঁঠাল, সেগুন, মেহগনি, বাবলা, পেয়ারা, আঙ্গুর, লিচু, কড়াই, জামরুল, শীল কড়াই, শিশু, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি গাছ লাগাচ্ছে।

বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীকে জোরদার করার লক্ষ্যে বিনামূল্যে বিভিন্ন জাতের চারা বিতরণ করে থাকে। ১৯৭৬ সাল থেকে সরকারিভাবে সাতক্ষীরায় বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৮১ সাল থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত সাতক্ষীরা জেলায় ৩৯৬.০৩ কি.মি. রাস্তা ও বাঁধ বনায়নভুক্ত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৬৩,২৫০টি চারা গাছ রোপণ করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ২০০০ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় জেলার ৭টি উপজেলায় চাষী উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ৪৪৪,৩৭১ টি চারা (এর মধ্যে ১৭৫০৭২ টি বনজ চারা, ২৪৩,৪৫৩ টি ফলজ চারা এবং ২৫,৮৪৬ টি ঔষধি চারা) রোপন করা হয়েছে।

এসব চারা গাছের মধ্যে আম, কাঁঠাল, মেহগনি, শিশু (রেন্ট্রি), পাহাড়ী নিম (বকাইন), দেবদারু (উইপিং), গামার, সিলকড়াই, আকাশমনি, সেগুণ, চম্পাফুল, চাপালিস, অর্জুন, আমলকি, বয়রা, হরিতকি, বাকলা, নাগের, লোহা কাঠ, বিলাতি গাব, রাজ কড়াই, শন বলাই ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ

সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ : সাতক্ষীরা জেলায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লোক সামুদ্রিক মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। উন্নত মাছ ধরার উপকরণ, বাজারজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, সমুদ্রে নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করা গেলে মাছ আহরণের পরিমাণ অনেক বাড়ানো সম্ভব। উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন এবং মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও ফড়িয়াদের উপদ্রব কমানোর ব্যবস্থা জেলেদেরকে মাছের উপযুক্ত মূল্য পেতে সহায়তা করবে। তবে মৎস্য আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তীরবর্তী এলাকার মাছের উপর চাপ কমিয়ে আনতে হবে এবং গভীর সমুদ্রের মাছের আহরণ বাড়াতে হবে।

সাতক্ষীরা জেলায় কাকঁড়া চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। সুন্দরবন সংলগ্ন নদী-নালাগুলোয় কাকঁড়া চাষ করে জনগণের উপার্জন বাড়ানো সম্ভব। এ ছাড়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাঁচায় কাকঁড়া চাষ করে বর্তমান উৎপাদন তিন গুন বাড়ানো সম্ভব।

বনজ সম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ : সাতক্ষীরা জেলায় বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন "সুন্দরবন"-এর একটি অংশ রয়েছে। এই বনজসম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করে জেলার বিপুলসংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে।

জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ : সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই জেলার চর ও দ্বীপগুলোয় শীতকালে অতিথি পাখিরা আশ্রয় নেয়। এ ছাড়া জেলার নদ-নদী, অববাহিকা ও উপকূল তীরবর্তী পানিতে বিভিন্ন ধরনের লোনা ও মিঠা পানির মাছ ও প্রাণী বাস করে থাকে। তাই এই জেলা জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা : সাতক্ষীরা জেলায় এখন পর্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ির ঘের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। যদিও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে কিন্তু এর ক্ষতিকারক প্রভাবও অনেক। তাই উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্ভাব্য এলাকা চিহ্নিত করে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ করতে হবে। নতুবা পুরো জেলাই ধীরে ধীরে মানুষ বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে।

শিল্প উন্নয়ন

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন : সুন্দরবনের জন্য সাতক্ষীরা জেলায় পর্যটন শিল্প বিকাশের একটি ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। মুন্সীগঞ্জে একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন গড়ে তোলা হলে এবং সুন্দরবন ভ্রমণের নিরাপদ ও আরামদায়ক ব্যবস্থা করা হলে এই জেলায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটতে পারে।

শিল্পাঞ্চল : জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে তেমনি অন্যদিকে উৎপাদন বাড়বে। এই সকল শিল্পাঞ্চলে স্ব স্ব উপজেলার প্রবাসীরা বিনিয়োগ করবেন। সরকার সব ধরনের অবকাঠামো এবং আইনগত সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন। ব্যক্তিখাত ও সার্বিক সহযোগিতা দেবেন।

ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার : এই জেলায় কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল যেমন পাট, তৈলবীজ, নারিকেল, সুপারি, ছন, বাশ ও বেঁত ভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। এ জন্য জনগণকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা দেয়া যেতে পারে। উন্নত পদ্ধতিতে শুটকি মাছ প্রস্তুত আরেকটি সম্ভাবনা যার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন

অবকাঠামো সংরক্ষণ : সাতক্ষীরা জেলা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ জেলা। তাই জনগণের জান মালের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো যেমন বাঁধ ও পোল্ডার, স্লুইস গেট ও রেগুলেটর, সাইক্লোন শেল্টার ও সংযোগ সড়ক, কিল্লা ইত্যাদি একটি সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্মাণ, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যন্ত অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে জেলার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ক্ষমতা বাড়ানো দরকার যাতে জেলার সমস্ত লোকই ঘূর্ণিঝড়ের সময় আশ্রয় নিতে পারে।

নিরাপদ পানি সরবরাহ : কলারোয়া পৌরসভাতে অধিবাসীদের আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চালু আছে। এই প্রকল্পের অধীনে পৌরসভার ত্রিশ হাজার অধিবাসীকে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ করা হবে। ডিপিএইচই'র সহযোগিতায় এবং জেশ ফাউন্ডেশনের অধীনে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পে একটি ওভারহেড ট্যাংক, একটি গভীর নলকূপ এবং ২৫০০ ফিট পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন করা হবে। এই প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়ে গেছে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

	২০০১	২০১৫	২০৫০
মোট লোক সংখ্যা (লাখ)	১৮.৪৫	২২.২৩	৩১.১৪
পুরুষ	৯.৩৬	১১.১৪	১৫.৫৭
নারী	৯.০৯	১১.০৯	১৫.৫৭
লিঙ্গ অনুপা	১০০:১০৩	১০০:১০০	১০০:১০০
শহুরে জনসংখ্যা (%)	৭	৬	৭

সাতক্ষীরা জেলায় বর্তমান জনসংখ্যা ১৮.৪৫ লাখ (২০০১)। ধারণা করা হচ্ছে এই লোকসংখ্যা বেড়ে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ হবে ৩১.১৪ লাখ। ২০১৫ সাল বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর। এই সময় নাগাদ লোক সংখ্যা হবে ২২.২৩ লাখ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা) পূরনের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি চলছে। মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। অবকাঠামো ও সরকারি পরিসেবার আরো অগ্রগতি হবে।

সরকার হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানির মাধ্যমে বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা আয়ের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। পাঁচ বছর মেয়াদে (২০০৪-২০০৮) ভিশন - ২০০৮ নামের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ বা প্রসেসরকে চিংড়ি চাষের জন্য ১০০ একর খাস জমি বরাদ্দের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে খাস জমি বরাদ্দের পাশাপাশি চিংড়ি শিল্পের কারখানার আধুনিকীকরণ, উন্নত ফিস মিলের নিশ্চয়তা, চিংড়ির মড়ক রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণসহ সরকারি বেসরকারি সব পর্যায়ে সমন্বিত বাস্তব কর্মসূচী হাতে নেয়া দরকার।

সাতক্ষীরা জেলায় তেল ও গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই জেলা ব্লক-৫ এর অধীনে পড়েছে। শেল বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ভূ-কম্পন জরীপ চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এই এলাকায় যদি তেল পাওয়া যায় তাহলে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমুহ সম্ভাবনা রয়েছে।

সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানোর জন্য ব্যক্তিখাতকে উৎসাহ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ব্যক্তিখাতে স্বল্পক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যেই টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও দেবহাটাকে নির্বাচন করা হয়েছে।

ভোমরা স্থল বন্দরকে সম্ভাবনা অনুযায়ী ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তবে এর উপযোগিতা বাড়ানোর জন্য সরকার এর মধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ এই বন্দরটিকে বিল্ড, অপারেট এন্ড ট্রান্সফার (BOT) চুক্তির অধীনে ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে। যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হলে এই বন্দর ব্যবহারকারীদের সুযোগ-সুবিধা অনেক বাড়বে এবং এই বন্দরের আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

বন বিভাগের সামজিক বনায়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জেলার গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকার জনগণ অত্যন্ত উপকৃত হচ্ছে। সামাজিক বনায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীরা সড়ক ও বাঁধের ঢালে বিভিন্ন রকম গাছ যেমন মেহগনি, শিশু, পেয়ারা, বাবলা, নিমগাছ এবং বিভিন্ন রকম সবজি যেমন বেগুন, টমেটো, মিষ্টি কুমড়া লাগিয়ে থাকেন। সবজির পুরোটাই উপকারভোগীরা পেয়ে থাকেন। গাছের মালিকানা হয় যৌথ। বর্তমানে এই প্রক্রিয়া এলাকায় অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছে।

সীমান্ত শহর হবার কারণে এবং ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে সাতক্ষীরার অধিবাসীরা এইডস নামক মরণব্যাধির মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

অপরিকল্পিত ও মাত্রাতিরিক্ত চিংড়ি চাষের ফলে এই জেলা ক্রমশ পরিবেশগত ও সামাজিক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যথোপযুক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে এই প্রবণতা রোধ করা দরকার, নতুবা অদূর ভবিষ্যতে এই জেলার একটি বড় অংশ মানুষ বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। জলবায়ুর পরিবর্তন, নদী প্রবাহ হ্রাস, নদী প্রবাহের দিক পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলেও সাতক্ষীরা জেলার বিপুল এলাকা হুমকির সম্মুখীন।

দর্শনীয় স্থান

সাতক্ষীরা জেলার একটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আছে। এই জেলার মানুষ সক্রিয়ভাবে নীল বিদ্রোহ, তিতুমীরের ওয়াহাবি আন্দোলন, ফরায়েজি আন্দোলন প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেছিল। এই স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলোকে সংরক্ষণ করা দরকার।

সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য প্রতি বছর এই জেলায় অনেক লোক আসে। শ্যামনগর উপজেলার মুন্শীগঞ্জে প্রতি বছর শীতকালে প্রচুর লোকের আগমণ লক্ষ্য করা যায়।

এই জেলায় অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান ও ভবন দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - মা চম্পার দরগা, (১৪১৭ সালে নির্মিত), জাহাজঘাটা নৌদূর্গ (মৌতলা ১৫৬৭ সালে নির্মিত), বড় দুয়ারী (ঈশ্বরীপুর, ১৫৮২ সালে), চেঙ্গা মসজিদ (বংশীপুর, ১৫৯৯ সালে নির্মিত), সোনাবাড়িয়া নবরত্ন মন্দির (কলারোয়া, ১৭৬৭ সালে নির্মিত), জোশেশ্বরি মন্দির (ঈশ্বরীপুর, ১৮৯৯ সালে নির্মিত), চান্দা বৈরবীর মন্দির, রাজা প্রতাপাদিত্যের দূর্গ, পারাবাজপুর মসজিদ (মুকুন্দপুর), গোপালপুর মন্দির, মৌতলা মসজিদ, অন্নপূর্ণা ও নবরত্ন মন্দির, সুলতানপুর মসজিদ, নগরঘাটা মসজিদ, কাটুনিয়া মসজিদ ইত্যাদি।

এই জেলায় বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের মেলা ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মেলা হল - গুড়পুকুরের মেলা, দুবলার মেলা, বাড়ুনি মেলা, দোল পূর্ণিমার মেলা, রথযাত্রা মেলা, বৈশাখি মেলা, পাড়ুলিয়া শশ্মান ঘাট মেলা, চরক মেলা, রাশ মেলা, দোল মেলা ইত্যাদি। দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় মেলাটি বসে সাতক্ষীরা শহরেই, পৌরসভার পলাশপোল গুড় পুকুরের পাড়ে। গুড় পুকুরের নামানুসারে মেলা নামকরণ করা হয়েছে "গুড় পুকুরের মেলা"।

এই জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বেশ কিছু স্থান রয়েছে। স্মৃতিবিজড়িত এই সব স্থানগুলোকে সংরক্ষণ করা হলে তা পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে।

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-র একটি প্রকল্প। এটি একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনায় এটি পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে ছয়টি কর্মসূচিতে ভাগ করা হয়েছে-

- উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
- একটি সমন্বিত জ্ঞান ভাণ্ডার

বর্তমানে প্রকল্প থেকে বহু বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনসহ উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণীত হয়েছে। উপকূল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নে উপকূলীয় এলাকার গণমানুষের পরামর্শ ও মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই প্রকল্প শুরুর সময় থেকে আজ অবধি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অনেকগুলো বৈঠক, গবেষণা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাক্রমিক বিবরণ নীচে তুলে ধরা হল।

উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী অধ্যয়ন	**মে-আগস্ট, ২০০২**
উপকূলীয় জেলার বিপদাপন্নতার কারণ অধ্যয়ন	**জুন, ২০০৩**
খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতির উপর জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা	**সেপ্টেম্বর, ২০০৩**

জনসাধারণের সার্বিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি এখানেই থেমে নেই। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চলতে থাকবে। খুব শিগগিরই প্রকল্প ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের উপর আলোচনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।